ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্মারকগ্রন্থ

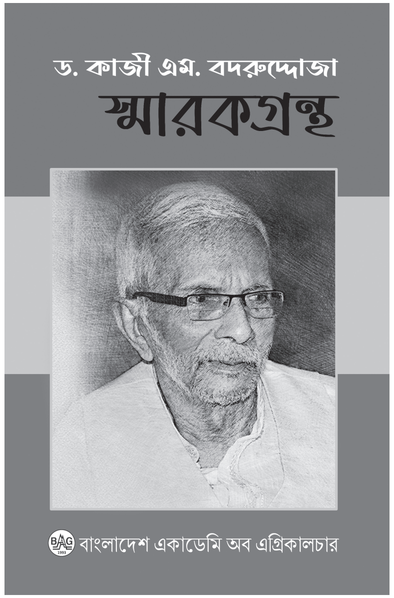

সম্পাদনা পর্ষদ

সভাপতি : ড. লুৎফুর রহমান
সম্পাদক : ফরিদ উদ্দিন আহমেদ
সদস্য : ড. এম. এ. মজিদ
সদস্য : ড. মোঃ আলী আকবর
সদস্য : ড. মোঃ গোলাম হোসেন
সদস্য : ড. মোঃ হামিদুর রহমান

BAAG 1993

বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার

প্রকাশকাল
১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪

প্রকাশক
বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার
বাসা: ২১, রোড: ২০, সেক্টর: ১৩, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।
ফোন: 01713 040 583
ই-মেইল: farid1952@gmail.com

প্রচ্ছদ
মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
গ্রাফিক ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া বিভাগ
শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি

মুদ্রণ
কথামুদ্রণ
১৪৮/১ জে, শাহ্ আলী বাগ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
ফোন: 01818 239 752
ই-মেইল: kathamuddran111@gmail.com

মূল্য : ৳ ৫০০.০০

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৩৭-০০৯৬-৪

Dr. Kazi M. Boddruddoza Sharokgrontho
Edited by : Farid Uddin Ahmed
Published by : Bangladesh Academy of Agriculture
Price : Tk 500.00
ISBN : **978-984-37-0096-4**

978-984-37-0096-4

সূচিপত্র

নাম	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
ড. মোঃ আলী আকবর	ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার বর্ণাঢ্য ব্যক্তি জীবনের খণ্ডচিত্র	০১
ড. এম. এ. মজিদ	কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের রূপকার ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা	০৯
ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া	অদৃশ্য সূতোর টান	২৩
Professor Dr. Lutfur Rahman	Dr. Kazi M. Badruddoza: The iconic figure of designing inclusive agricultural research and development in Bangladesh	৩১
ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার	বাংলাদেশের কৃষি বিনির্মাণের কারিগর: ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা	৩৭
ড. দেবাশীষ সরকার	আমার দেখা কাজী বদরুদ্দোজা	৪৩
ড. আবদুল হালিম	ইমেরিটাস কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা	৪৯
ড. আনোয়ারুল কাদের শেখ	ইমেরিটাস কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার সাথে আমার পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনের অসামান্য স্মৃতিসমূহের বিবরণ	৫৭
ড. মোঃ সামসুল আলম	ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা- একজন নিবেদিত কৃষিবিজ্ঞানী	৬৩
ড. মোঃ আলী আকবর	ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্মরণে	৬৫

নাম	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
Dr. Zahurul Karim	Reminiscence of Dr. Kazi M. Badruddoza	৬৭
ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম ও ড. নির্মল চন্দ্র শীল	স্মৃতির আখরে পথিকৃৎ বিজ্ঞানী কৃষিবিদ ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা	৭১
ড. ওয়ায়েস কবির	ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা: বাংলাদেশের কৃষি উৎকর্ষের আলোকবর্তিকা	৭৯
Dr. Jiban Krishna Biswas	Dr Kazi M Badruddoza: a saviour of the hungry millions	৮৫
ড. মোঃ হামিদুর রহমান	কৃষির কিংবদন্তী আমাদের কাজী স্যার	৮৯
মনজু আরা বেগম	কাজী বদরুদ্দোজা: কৃষি গবেষণা এবং উন্নয়নের পথিকৃৎ	৯৭
ড. আবুল কালাম আযাদ	ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা: শেষ জীবনের অসমাপ্ত স্বপ্ন	১০৩
এম তারিক হাসান	স্মৃতির আয়নায় চির অম্লান ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা	১১১
মোহাম্মদ মাসুম ও ফরিদ উদ্দিন আহমেদ	স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্মরণে	১১৭
Dr. Indrajit Roy	Paying homage to Kazi M. Badruddoza	১২৭
Dr. Tasneem Omar Ali	In Memory of my beloved father Dr. Kazi M. Badruddoza	১৩১
Dr. Jeffry Kazi	My Dad Dr. Kazi M. Badruddoza: The leader of people in Bangladesh	১৩৫

নাম	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল	শ্রদ্ধাঞ্জলি: ড. কাজী এম. বরুদোজ্জা	১৩৭
রওশন এ রহমান	প্রথিতযশা কৃষি বিজ্ঞানী ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজাকে নিয়ে কিছু স্মৃতিচারণ	১৪৩
ড. ফেরদৌসী ইসলাম আইভি	কৃষির কিংবদন্তি ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা	১৪৯
ড. এম. এ. মজিদ	স্মৃতির পাতায় ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা	১৫৫
ড. মোঃ গোলাম হোসেন	হৃদয়ের পংক্তিমালা	১৬৩
আরতি সরকার	পিতৃতুল্য পরম শ্রদ্ধেয় ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা	১৬৫
মোঃ এখলাছ উদ্দীন	ইমেরিটাস বিজ্ঞানী মরহুম ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্যারের সাথে পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিসমূহ	১৬৯
ফরিদ উদ্দিন আহমেদ	ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা: বাংলাদেশের কৃষিপিতা ও দূরদর্শী এক ব্যক্তিত্ব	১৭৫

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের রূপকার ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা গত ৩০ শে আগস্ট ২০২৩ সালে ৯৭ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত জটিলতায় উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিলের চাকুরি থেকে পদত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে যোগদান করেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে তাঁকে দেশের উন্নয়নে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের গুরুত্ব সর্ম্পকে অবহিত করেন। বঙ্গবন্ধু এজন্য তাঁকে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের সহায়ক প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো তৈরি ও জনবল সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ড. বদরুদ্দোজা প্রথমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল পুনর্গঠন ও পরবর্তীতে বহুমাত্রিক ফসল গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট তৈরির উদ্যোগ নেন। বস্তুত তিনি কৃষির সকল সেক্টরের উন্নয়নের জন্য নানান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং যে কোন বিষয় স্বল্প কথায় উপস্থাপনে দক্ষ। তিনি একদিকে যেমন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমূহ সমর্থন পেয়েছিলেন, তেমনি তাঁর দক্ষতা, সততা ও দূরদর্শিতার কারণে উন্নয়ন সহযোগীদের আস্থা অর্জনেও সমর্থ হয়েছিলেন। দেশের কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন বিনির্মানে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা পেতে তাঁকে মোটেও বেগ পেতে হয়নি। তিনি শুধু কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো তৈরি করেন নি, একই সাথে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ জনবল তৈরি করার উদ্যোগও নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের কৃষি বিষয়ক স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা প্রণয়নে উনি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। এমনকি প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে মাঠ পরিদর্শনসহ নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর অবদান শুধু দেশেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, তিনি ভিয়েতনামের কৃষি উন্নয়নেরও রূপকার হিসেবেও স্বীকৃত কারণ যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামের কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা তাঁকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সকল কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ, কৃষক ও তথা সর্বস্তরের জনগণ ড. বদরুদ্দোজার কাছে ঋণী কারণ

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তায় তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাঁকে ২০১২ সালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'স্বাধীনতা পুরস্কার' দানে ভূষিত করেছে। একইসাথে তাঁকে ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট সম্মানেও ভুষিত করা হয়।

ড. বদরুদ্দোজার মৃত্যুর পর দেশ বিদেশে অনেক শোক সভা হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ব্যক্তি হিসেবে ড. বদরুদ্দোজা ছিলেন নিতান্তই একজন সাদামাটা মানুষ। তিনি তাঁর উত্তরার সাড়ে তিন কাঠার প্লটে একটি এক হাজার বর্গফুটের বাড়িতে অনেকটা একাকীই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। পরিবারের বাকী সদস্যগণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং নিজ নিজ জগতে খ্যাতিমান। তিনি পরিবারের কাছে যেতেন কিন্তু দেশের টানে বার বার ফিরে আসতেন। তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন কৃষি সংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের সাথে কৃষি নিয়ে গল্প করতে। রাত দিন স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়ন নিয়ে। কৃষিতে তাঁর অবদান অপরিসীম। তবুও তাঁর কিছু স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেছে। তিনি আমাদের দেশে ভূট্টা ও গম চাষ সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু তিনি বার বার বলতেন, আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ভাবে ভূট্টার দানা থেকে উন্নতমানের কর্ণ অয়েল বা ভূট্টার তেল উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু তিনি তা দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশে এভোকাডো ফল চাষ সম্প্রসারণ করা। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে গেলেও এ পর্যন্ত দেশের আবহাওয়া উপযোগী কোন জাত অবমুক্ত করতে পারেনি। তাঁর এ স্বপ্ন আমাদের দিয়ে গেছেন। আমাদের এ বিষয়ে গবেষণা করে তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। এছাড়াও, তিনি মনে প্রাণে চাইতেন বাংলাদেশে একটি প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল ধরণের উদ্ভিদের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হবে। কিন্তু এ স্বপ্নও বাস্তবে পূরণ হয়নি। এ বিষয়গুলি তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। আমাদের এ বিষয়ে কাজ করতে হবে।

ব্যক্তি ড. বদরুদ্দোজা কেমন ছিলেন তার বণ্যাঢ্য পরিচয় এ স্মারকগ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। চাকুরি জীবনে ড. বদরুদ্দোজা অত্যন্ত রাশভারী ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে একটি কোমল মন ছিল তার সন্ধান

যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা তাদের প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন। সত্যি বলতে কী, যে মানুষটি কৃষিকে ভালোবেসে পরিবারের চাইতে দেশ ও কৃষি নিয়ে ভাবতে ভাবতে একাকী নিজ দেশে জীবন কাটিয়ে দিলেন। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার মাত্রা নির্ণয় চেষ্টা করা এবং তা ভাষায় প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়। তাঁর অবদানের জন্য আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তিনি হতে পারতেন বড় ডাক্তার বা প্রকৌশলী। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই দেশে খাদ্যাভাব এবং গ্রামীণ কৃষিজীবি মানুষের দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ করে তিনি কৃষি নিয়ে পড়াশুনা করতে মনস্থির করেছিলেন। দেশ বিদেশে তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ স্মারকগ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁর মেধার বর্ণনা রয়েছে। এখানে মোট ৩০টি প্রবন্ধ রয়েছে। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা ড. বদরুদ্দোজাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। আরো অনেকেই লিখতে চেয়েছিলেন। বিলম্ব এড়াতে প্রথম সংস্করণ বের করা হলো। পাঠকের চাহিদা বিবেচনা করে হয়ত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার সময় আরো অনেক লেখকের প্রবন্ধ তাতে অর্ন্তভুক্ত করা সম্ভব হবে।

চেষ্টা করা হয়েছে এ সংস্করণে যেন ভুল ভ্রান্তি না থাকে। তবুও যদি কারো নজরে ভুল ধরা পড়ে, দয়া করে জানিয়ে আমাদের সহায়তা করবেন যাতে দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা স্মারকগ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে পারি। এ গ্রন্থের লেখকদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যাঁরা প্রবন্ধ পাঠাতে চেয়েছিলেন কিন্তু এখনও পাঠাতে পারেন নি, দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন। আপনাদের মাধ্যমে আমরা ড. বদরুদ্দোজাকে আগামী প্রজন্মের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আমরা তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

প্রফেসর লুৎফুর রহমান
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার বর্ণাঢ্য ব্যক্তি জীবনের খণ্ডচিত্র

ড. মোঃ আলী আকবর

এই লেখাটি আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন, বাংলাদেশের কৃষির প্রাণপুরুষ, জীবন্ত কিংবদন্তি ও আধুনিক কৃষি উন্নয়নের পথিকৃৎ ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা এর সাথে প্রিন্ট মিডিয়া "মুক্ত আকাশ" এর বিশেষ প্রতিনিধি এম এ খালেকের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক একটি প্রতিবেদন। এখানে উঠে এসেছে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল বংশ পরিচিতি, ছাত্র জীবনের কৃতিত্ব, কর্মজীবনের সোনালি অতীত ও বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কৃষি বিষয়ক ভাবনা। লেখাটি আত্মজীবনীমূলক হলেও এই কৃতি পুরুষের একান্ত ব্যক্তি জীবনের কথা। তাই, এ লেখাটি সেই মহৎ মানুষটির জীবনের কিছু বিশেষ অংশের অবতারণার প্রয়াস। ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত সাদামাটা, সহজ সরল এবং স্বল্পভাষী এই মানুষটি সারাজীবন কৃষকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বা তাদের খোঁজ খবর নিতে পছন্দ করতেন। অনেক কৃষকের সঙ্গে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ। আজ সেই কীর্তিমান শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন পরলোকে। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি।

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষি বিজ্ঞানী ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর এগ্রিকালচার রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখান থেকে পি.এইচডি. ডিগ্রি অর্জনের পর দেশে ফিরে কৃষি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। কৃষি ক্ষেত্রে তাঁর অনেক উদ্ভাবন রয়েছে। তবে বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের একদল বিজ্ঞানী কর্তৃক পেয়ারার একটি জাত উদ্ভাবনের পর এটি ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার নামানুসারে 'কাজী পেয়ারা' নামকরণে সাধারণ মানুষের কাছে ড. বদরুদ্দোজা সুপরিচিত হয়ে উঠেন। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অধিকারী ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। কর্মের স্বীকৃতি

হিসেবে পেয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন "স্বাধীনতা পুরস্কার"। এই বর্ষীয়ান কৃষি বিজ্ঞানী জীবনের শেষ মুহূর্ত (প্রায় ৯৭ বছর বয়স) পর্যন্ত তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার এর মাধ্যমে তার মেধা ও পরিশ্রমের দ্বারা বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে অবদান রেখে গেছেন।

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার বাল্যকাল এবং শিক্ষা জীবন সম্পর্কে মুক্ত আকাশ প্রতিনিধির কিছু জানতে চাওয়ার উত্তরে তিনি জানান যে, ১৯২৭ সালের ১ জানুয়ারি বগুড়ায় তাঁর মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, যদিও তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল তৎকালীন গাইবান্ধা মহকুমা শহরে, যেটি বর্তমানে একটি জেলা। তার বাবা কাজী বদিউজ্জামান ছিলেন গাইবান্ধা কোর্টের স্বনামধন্য একজন আইনজীবী। মা জমিলা খাতুন ছিলেন গৃহিণী। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবার বড়। তার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে গাইবান্ধা শহর এবং গোবিন্দগঞ্জে। তবে তাদের পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস ছিল ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় মিরাট রাজ্যে। তাঁরা ছিলেন নবাব বংশীয়। তাঁর বড়-পিতামহ ছিলেন ১৮৫৭ সালে সংঘটিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন অগ্রসৈনিক। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সিপাহি বিদ্রোহের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ দৃশ্যত ব্যর্থ হলে তিনি প্রাণ বাঁচাতে পবিত্র নগরী মক্কায় পালিয়ে যান। সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর দেশে ফিরে আসেন এবং অবিভক্ত বাংলার উত্তরাঞ্চলীয় গ্রামীণ নিরাপদ জনপদ গাইবান্ধা জেলার ঢোলভাঙ্গা ও গোবিন্দগঞ্জে বসতি গড়ে তোলেন। তার উত্তরসূরী ড. বদরুদ্দোজার পিতামহ কলকাতা থেকে মেডিকেল ডিগ্রি নিয়ে বাংলাদেশের গোবন্দিগঞ্জে ডাক্তারি শুরু করেন। তাঁর বড়-মাতামহ ১৮৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রি নেন এবং কলকাতা ও বগুড়া জেলায় অ্যাডভোকেট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তার বড় ছেলে মরহুম আজিজুল বারী তৎকালীন ভারতীয় কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

ড. বদরুদ্দোজা পড়াশুনায় বেশ মেধাবী ছিলেন। শৈশবে গাইবান্ধায় লেখাপড়া শুরু করেন। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁকে অনেকটা জোর করে

গোবিন্দগঞ্জ স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কারণ, গোবিন্দগঞ্জ স্কুলে কোনো ছেলে ভালো রেজাল্ট করতে পারতো না, আর এই বন্ধ্যাত্ব ঘুচানোর জন্যই তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি তাদের হতাশ করেননি। তিনি নবম এবং দশম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৪২ সালে ইংরেজিতে লেটার মার্কসসহ ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৪ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে আই.এসসি. পাশ করেন। এরপর ১৯৪৫ সালে উপমহাদেশের প্রথম কৃষি কলেজ তেজগাঁওস্থ বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটে (বর্তমান শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৪৮ সালে বি.এজি. এবং ১৯৫২ সালে এম.এজি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি পাকিস্তানের বিভাগীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুমোদনক্রমে এগ্রিকালচার রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর 'ফুল ব্রাইট' স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং সেখান থেকে ১৯৫৬ সালে পি.এইচডি. এবং ১৯৬১ সালে সুইডেন থেকে পোস্ট ডক্টরেট সম্পন্ন করে দেশে ফিরে কৃষি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

মুক্ত আকাশের পক্ষ থেকে কাজী পেয়ারা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তাঁর সঙ্গে অনেক বিদেশি এক্সপার্ট চাকরি করতেন। এর মধ্যে কয়েকজন ছিলেন জাপানি। জাপানি টিম থাইল্যান্ড থেকে বড় আকারের কয়েকটি পেয়ারা নিয়ে এসেছিল। তিনি তখন সেই থাই পেয়ারা বরিশালের পেয়ারার সঙ্গে সংকরায়ণ (ক্রস) করে দেখার জন্য কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করেন। সেখান থেকে যে নতুন ফল পাওয়া গিয়েছিল তা একটি হাইব্রিড জাতীয় পেয়ারা, সেই পেয়ারার নাম দেয়া হলো কাজি পেয়ারা, অর্থাৎ গবেষকগণ ড. কাজী বদরুদ্দোজার নামানুসারে এ পেয়ারার নামকরণ করেন। কাজি পেয়ারার ফুড ভ্যালু বিশ্লেষণ করেও ভালো ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল। একটি আপেল খেলে যে পরিমাণ পুষ্টি পাওয়া যায়, একটি কাজী পেয়ারা খেলেও ঠিক ততটাই পুষ্টি পাওয়া সম্ভব। কাজী পেয়ারা পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এবং দামে কম। খেতে বেশ সুস্বাদু। মূলত: এসব কারণেই কাজী পেয়ারা জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গঠনের ইতিহাস বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে ড. বদরুদ্দোজা বলেন যে, ফার্মগেটে তখন একটি পাঁচতারা হোটেল নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছিল। সিলেটের আব্দুস সামাদ আজাদ ছিলেন তখন কৃষিমন্ত্রী। উনার পরামর্শে তিনি সরাসরি বঙ্গবন্ধুর নিকট যান। বঙ্গবন্ধুকে বলেন যে ফার্মগেট কৃষির মূল কেন্দ্র। এখানকার কৃষি খামার দেশের কৃষি উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এখানে কৃষির উন্নয়নের কাজ করার পরিবর্তে ফাইভ স্টার হোটেল বানানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তাই তিনি বঙ্গবন্ধুকে হোটেল নির্মাণের উদ্যোগ বন্ধ করে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু বিষয়টি অনুধাবন করে সে মোতাবেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পাঁচতারা হোটেলের পরিবর্তে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। এভাবেই ওখানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল স্থাপিত হয়েছিল। ড. বদরুদ্দোজা মনে করতেন কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের কৃষির মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, যা আজ প্রায় ১৮ কোটি মানুষের খাদ্যের জোগান দিচ্ছে। এভাবেই চমৎকার একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গড়ে উঠে এবং এর পুনর্বিন্যাসও তাঁর নেতৃত্বেই হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ছাড়াও বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট তাঁরই নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে দেশে কৃষি বিষয়ক তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। সবকিছুই গড়ে উঠেছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে। যদিও বাংলাদেশই ছিল কৃষি প্রধান একটি অঞ্চল। পাকিস্তানে থাকাকালীন সময়েও তিনি সে দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে প্রচুর অবদান রেখেছেন। পাকিস্তানিরা তাঁকে যথেষ্ট সম্মান ও সমীহ করে চলতো। তারা তাঁকে উপযুক্ত মূল্যায়নও করতো। ড. কাজী বদরুদ্দোজা যখন বাংলাদেশে আসার জন্য অপশন দিয়েছিলেন তখন সে দেশের কৃষি সচিব বলেছিলেন যে, সবাইকে যেতে দিতে পারেন কিন্তু কাজী বদরুদ্দোজাকে যেতে দেবেন না। কারণ, পাকিস্তানের কৃষির উন্নয়নের জন্য তাঁর দরকার আছে। কাজী বদরুদ্দোজা তখন বলেছিলেন যে, বাংলাদেশ তার নিজের দেশ, সেখানেও কৃষির উন্নয়নে কাজ করার প্রয়োজন আছে। তিনি তাঁর নিজ দেশেই চলে যেতে চান।

সবকিছুই নতুন করে শুরু করলেন। কৃষি গবেষণার প্রয়োজনীয় ইনস্টিটিউট তৈরি করলেন, এবং দক্ষ জনবল তৈরি করলেন। ফলে কৃষি খাতের উন্নয়নে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। এর পেছনে উনার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

ফসলের বহুমুখীকরণের ব্যাপারে তাঁর অবদান প্রসঙ্গে ড. কাজী বদরুদ্দোজা বলেন, শুধু একটি বা দু'টি ফসলের ওপর নির্ভর করে একটি দেশ কখনোই তার কৃষি সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে না। তাই তিনি ফসলের বহুমুখীকরণের দিকে জোর দিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি বাংলাদেশে আসার পর ভুট্টা এবং গমের চাষ সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেন। উনার পরামর্শে চাষিরা জমি থেকে বন্যার পানি সরে যাবার পর সেখানে ভুট্টার বীজ বপন করেছেন। ভুট্টার চাষ এখন বেশ লাভজনক হয়েছে এবং বাংলাদেশে ভুট্টা চাষ সম্প্রসারণে উনার ভূমিকা অপরিসীম। ভুট্টার চাষ একদিকে যেমন মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক তেমনি গবাদি পশুর খাবার হিসাবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে ভুট্টার মাধ্যমে পোল্ট্রি ফিড তৈরি হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ভুট্টার আবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে। ভুট্টা এবং গমের আবাদ হওয়ার ফলে মানুষের চালের ওপর নির্ভরতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে।

একজন মেধাবী ছাত্র হয়েও তিনি কেন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে কৃষি বিজ্ঞানী পেশা বেছে নিয়েছিলেন এমন প্রশ্নের উত্তরে ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা বলেন, অন্য পেশায় গেলে তিনি হয়ত প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক হতে পারতেন কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে এত কিছু করতে পারতেন না। কৃষি বিজ্ঞানী হয়ে তিনি দেশকে কিছু দিতে পেরেছেন এটাই তাঁর বড় প্রাপ্তি।

সিলেটের হাওর এলাকায় অকাল বন্যায় ফসলের ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে আমাদের কি করা উচিত বলে মনে হয়, এমন প্রশ্নের উত্তরে ড. বদরুদ্দোজা বলেছিলেন, এর থেকে বাঁচার জন্য বন্যার পানির নিচে ধান গাছ নষ্ট হয় না এমন ফসলের জাত আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে। এমন জাত বাংলাদেশে ছিল। কিন্তু আমরা প্রায় হারিয়ে ফেলেছি। হয়ত ব্রি এর জিন ব্যাংকে আছে।

বন্যা সহিষ্ণু এ জাতের ফলন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় দিয়ে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে। কৃষির কাঁচামাল নির্ভর শিল্পায়ন সর্ম্পকে ড. বদরুদ্দোজা বললেন, আমাদের দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্পের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের কৃষকেরা ভরা মৌসুমে ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। তখন তারা স্বল্পমূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে দেয় বা গরু ছাগলকে খাইয়ে দেয়। এ জন্য কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন। কৃষিনির্ভর শিল্প গড়ে উঠলে শিল্প খাত আমদানি নির্ভর কাঁচামাল থেকে মুক্তি পাবে। এই সম্ভাবনাকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে হবে। পাকিস্তানে ভুট্টার আবাদ বাড়ানোর সাথে সাথে ভুট্টা থেকে তেল তৈরি করতে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের কৃষি গবেষণা এবং উন্নয়ন বিষয়ে ড. বদরুদ্দোজার বক্তব্য হলো, উন্নত দেশে কৃষি গবেষণায় অনেক গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন সে পরিমাণ গুরুত্ব এখনও পাচ্ছে না, যদিও বা বাংলাদেশ কৃষিতে অনেক উন্নতি করেছে। কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য আমাদের দক্ষ জনবল তৈরি ও তাদের গবেষণার জন্য পরিবেশ তৈরি করতে হবে। হতাশা নিয়ে যে বিজ্ঞানী কাজ করবেন, তিনি সুযোগ পেলেই দেশের বাইরে চলে যাবেন।

আগামীতে সমুদ্রই হবে আমাদের খাদ্য জোগানের সবচেয়ে বড় উৎস। এ ব্যাপারে ড. বদরুদ্দোজা বলেন, সমুদ্রকে যদি ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় তাহলে সেখান থেকে প্রচুর খাদ্যের জোগান পাওয়া সম্ভব। সমুদ্র থেকে প্রচুর মাছ আহরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া নানা ধরনের উদ্ভিদজাত খাদ্য সমুদ্র থেকেই সংগ্রহ করা যেতে পারে।

দেশের কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি হওয়া উচিত, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষের আবাসিক চাহিদা পূরণ, শিল্প স্থাপন এবং অন্যান্য নানা কাজে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন জমির প্রয়োজন হচ্ছে। এ কারণেই মূলত: আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। কারো কারো মতে, প্রতিবছর গড়ে এক শতাংশ আবাদি জমি হ্রাস পাচ্ছে। এটা আমাদের জন্য খুবই উদ্বেগজনক বিষয়। চলমান অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য জমির ব্যবহারে আমাদের আরো মিতব্যয়ী হতে হবে। বিশেষ করে উর্বর এবং ভালো ফসল হয় এমন জমি শিল্পকারখানা স্থাপন, বাড়ি-ঘর নির্মাণ বা ইটভাটা

স্থাপনের জন্য ব্যবহার না করাই উত্তম।

এ ছাড়া আগামীতে মানুষ আরো বৃদ্ধি পাবে। ফলে খাবারের সংস্থান করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। এসব কারণে আগামীতে আমাদের এমন সব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে যাতে স্বল্প জমিতে বেশি ফসল উৎপাদিত হয় এবং জমির ব্যবহার বিষয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করতে হবে। বর্তমানে সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০টি স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি ভালো উদ্যোগ, তবে খেয়াল রাখতে হবে এগুলো যেন অনুর্বর এবং কম ব্যবহৃত জমিতে স্থাপন করা হয়।

অনেক কিছু পাওয়ার পর জীবনে এমন একটি অপূরণীয় প্রত্যাশার কথা মুক্ত আকাশ কর্তৃক জানতে চাইলে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রত্যাশার চাইতেও অনেক বেশি পেয়েছেন। কিন্তু তারপরও কিছু অপ্রাপ্তি যে নেই তা নয়। উনার কিছু উদ্যোগ সফল করতে না পারার ব্যর্থতার কথা বললেন। যেমন কৃষি বিজ্ঞানীগণ পদোন্নতির যোগ্য হওয়ার পর পরই তাদের পদোন্নতির বিষয়ে কাউন্সিলের পদোন্নতি পলিসি ও বিধান তৈরির চেষ্টা এবং সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে পদোন্নতি। কোনো ধরনের তদবির বা দলীয় আনুগত্য বা কোটা যেন সেখানে প্রাধান্য না পায়। তিনি জানেন না বিদ্যমান সামাজিক বাস্তবতায় তাঁর এই চাওয়া বা প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হবে। তবে তিনি মনে করেন, দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে, বিশেষ করে দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং পদোন্নতির ব্যবস্থা করা গেলে কৃষি বিজ্ঞানীদের দেশের বাইরে যাবার প্রবণতা অনেকটাই কমে আসবে। তারা নিশ্চিন্তে দেশের সেবা করতে পারবেন।

অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং সম্মাননা ড. বদরুদ্দোজার, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পুরস্কারের বিষয়ে মুক্ত আকাশ প্রতিনিধি জানতে চাইলে ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা বলেন, তিনি তাঁর কর্মজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে অনেকগুলো পুরস্কার এবং সম্মাননা অর্জন করেছেন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালে তাঁকে 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব প্রদান করেন। একইভাবে পরবর্তী বছর তাঁকে

'তমঘা-ই-পাকিস্তান' খেতাব দেওয়া হয়। বাংলাদেশে জেবুন্নেসা-কাজী মাহবুবউল্লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট তাঁকে ১৯৮৩ সালে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'সায়েন্টিস্ট ইমেরিটাস' পদ দিয়ে সম্মানিত করেন, একই সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের রাষ্ট্রদূতের মারফত কৃষি বিষয়ে তাঁর অবদানের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করে পত্র প্রদান করে। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন ১৯৯১ সালে তাঁকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৯৯ সালে তাঁকে কনসালটেটিভ গ্রুপ অব ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চ ও বিশ্বব্যাংক ওয়াশিংটন ডিসি-তে বিশেষ সম্বর্ধনা প্রদান করে। ভারতের বিশ্ব উন্নয়ন সংসদ তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। এছাড়া বাংলাদেশ হর্টিকালচার সোসাইটি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস রিসার্চ কাউন্সিল, প্ল্যান্ট ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিক্স সোসাইটি অব বাংলাদেশ, আবু হোসেন সরকার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার, বাংলাদেশ একাডেমি অব সাইন্সেস, ড. এম. ও. গণী মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও তাঁকে বিভিন্ন সময় স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'স্বাধীনতা পুরস্কার' প্রদান করে। তিনি আন্তর্জাতিকভাবেও অনেকবার সম্মানিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর মতে নিজের দেশে সম্মানিত হওয়া বা স্বীকৃতি পাওয়ার আনন্দটাই আলাদা। তিনি স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

পরিশেষে 'মুক্ত আকাশ' প্রতিনিধি এবং ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা, একে অপরকে ধন্যবাদ জানান।

(লেখাটি, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত ও পরিমার্জিত/পরিবর্তিত।)

লেখক : সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের রূপকার ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা

ড. এম. এ. মজিদ

ভূমিকা

প্রায় অর্ধশতক ধরে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সোনালি অধ্যায় রচনা শেষে চিরবিদায় নিলেন এদেশের কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের রূপকার, অসাধারণ মেধা ও পেশাগত জ্ঞানের অধিকারী, সফল কৃষি উন্নয়ন ব্যবস্থাপক, স্বাধীনতা পদকে ভূষিত ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা। গত ৩০ আগস্ট ২০২৩ তারিখ বুধবার বিকাল ৪ টায় ৯৭ বছর বয়সে ঢাকার উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার এর সকল ফেলোসহ দেশের সকল কৃষিবিদ কাজী স্যারের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। আমরা কাজী স্যারের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

কাজী স্যারের মৃত্যুর পর চারটি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় মৃত্যুর দিন বাদ এশা রাত ১০টায় স্যারের বাসার কাছেই উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টরের জামে মসজিদে। পরদিন ৩১ আগস্ট সকাল ৮ টায় ঢাকাস্থ কৃষিবিদি ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপিসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তৃতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় স্যারের হাতে গড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ, জয়দেবপুর দুপুর ১২.৩০টায়। গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জে বাদ এশা রাত ১০টায় চতুর্থ এবং সর্বশেষ জানাজা শেষে বাবা-মায়ের কবরের পাশে স্যারকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। এসব জানাজায় স্যারের অসংখ্য গুণগ্রাহী স্যারের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বিভিন্ন স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল তা সম্প্রচার করে।

অবদান

দূর অতীতে ৪০ এর দশকে মানুষ যখন চিন্তাও করতে পারেনি - এদেশে কৃষি

শিক্ষা ও গবেষণা কোন শিক্ষা ও পেশার বিষয় হতে পারে, ঠিক তখনই ড. কাজী বদরুদ্দোজা ভেবেছিলেন - কৃষিই হবে জনবহুল বাংলাদেশের খাদ্য সরবরাহ ও উন্নয়নের প্রধান অবলম্বন। মূলতঃ এ ভাবনা থেকেই তিনি কৃষি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ১৯৪৫ সালে ঢাকার তেজগাঁওস্থ তৎকালীন বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট-এ ভর্তি হন এবং ১৯৪৮ সালে উক্ত ইনস্টিটিউট থেকে বিএজি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএজি, ১৯৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লুজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি, ১৯৮০ সালে সুইডেনের ল্যুন্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্ল্যান্ট ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স-এ পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। এদেশের তীব্র খাদ্য সমস্যার কথা উপলব্ধি করে তিনি স্নাতক ডিগ্রি শেষে ১৯৪৮ সালে ডিভিশনাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার মাধ্যমে পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কৃষি পেশায় আত্মনিয়োগ করেন।

সে সময় থেকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি নিজেকে কৃষি উন্নয়নে জড়িত রেখেছেন। এদেশের আধুনিক কৃষি গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের ধ্যানধারণা মূলত: সব তাঁরই চিন্তা প্রসূত। তিনি ছিলেন কৃষির জন্য নিবেদিত প্রাণ। এমনকি মৃত্যুর পূর্বে আইসিইউতে স্থানান্তরের আগের দিন তিনি হাসপাতালে আমাকে বলছিলেন, 'একাডেমির পরবর্তী মিটিং কবে? আমি সভাপতিত্ব করব'। উল্লেখ্য, কাজী স্যার ছিলেন বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার (বাগ) এর প্রেসিডেন্ট আর আমি (ড. এম এ মজিদ) জেনারেল সেক্রেটারি। ৯৭ বছর বয়সেও স্যার অত্যন্ত সফলভাবে মিটিং পরিচালনা করতেন, প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতেন, সকল কাজের তদারকি ও অগ্রগতির খবর রাখতেন। তাঁর প্রখর স্মরণ শক্তির কারণে তাঁকে আমি 'লিভিং কম্পিউটর' বলে আখ্যায়িত করি। টেলিফোনে একাডেমির সকল ফেলোদের কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারতেন কে কথা বলছে। টেলিফোন ধরে বলতেন......হ্যা অমুক বল। এমনকি কোন ফেলোর পরিবারের কোন সদস্য অসুখ-বিসুখে পড়লে নিয়মিত টেলিফোনে খোঁজ-খবর নিতেন। এদিক থেকে তিনি বিরল মানবিক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। একই সাথে তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক ছিলেন। নিজে কাজ করতেন এবং সহকর্মীদের দ্বারা যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ করিয়ে নিতেন। প্রশাসনে যেমনি কঠোর ছিলেন তেমনি প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বিশেষে সকলকে অন্তর দিয়ে

ভালোবাসতেন।

এই বরেণ্য কৃষিবিজ্ঞানী পাকিস্তান কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (পিএআরসি) এর নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, এফএও/ইউএনডিপি কৃষি গবেষণা প্রোগ্রাম, হ্যানয়, ভিয়েতনাম এর প্রধান গবেষণা উপদেষ্টাসহ বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৫০ এর দশকে বাংলাদেশে ভুট্টা উন্নয়ন গবেষণা ও ১৯৭০ এর দশকে বাণিজ্যিকভাবে গম উৎপাদন শুরু করেন। বাংলাদেশে ফল চাষের সম্প্রসারণে তিনি অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন। দেশে ফলের ব্যাপক ঘাটতি, বছরব্যাপী ফলের অপ্রাপ্যতা এবং বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে ফল আমদানির প্রেক্ষাপটে তিনি ২৩ জুলাই ২০২২ তারিখে বিএআরসিতে ‘বছরব্যাপী পুষ্টিকর ও উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদন’ শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করেন। তিনি এতে সভাপতিত্ব করেন ও কৃষিমন্ত্রী ড. এম. এ. রাজ্জাক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। গত কয়েক বছর ধরে উচ্চমূল্যের মালটা, স্ট্রবেরি, ড্রাগন, কাজুবাদাম, রাম্বুটান, এভোকাডো ইত্যাদি ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাগিদ দিতেন।

তিনি এদেশে কাজী পেয়ারার প্রবর্তন করেন এবং তাঁর নামেই এর নামকরণ করা হয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় এদেশে অত্যন্ত মিষ্টি জাতের আম্রপালি আম প্রবর্তন করা হয় যা বাংলাদেশে বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মাশরুমের একটি ছত্রাক *Kaziboletus rufescens* ড. কাজী বদরুদ্দোজার নামে নামকরণ করা হয়েছে। দূরদর্শী এই বিজ্ঞানীর সাম্প্রতিক ভাবনা ছিল ভুট্টার তেল উৎপাদন এবং বাংলাদেশে তার ব্যবহার বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার ও সিমিটের যৌথ উদ্যোগে ০৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বিএআরসিতে একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করেন এবং তিনি তাতে প্রধান অতিথি হিসেবে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। ৯৭ বছর বয়সেও তীক্ষ্ম মেধা ও অপরিসীম বোধশক্তির কারণে তিনি কৃষির উন্নয়নে নিত্য নতুন ধ্যানধারণা দিয়ে গেছেন যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যার বাস্তবায়ন একান্ত জরুরি।

দূরদর্শী কৃষিবিজ্ঞানী ড. বদরুদ্দোজার নেতৃত্বেই এদেশে কৃষি গবেষণার গোড়াপত্তন হয়। কৃষির সার্বিক উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন পূর্বশর্ত। এটা মাথায় রেখেই তিনি কৃষি গবেষণার অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ গবেষণা জনশক্তি তৈরি, গবেষণা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি জোরদারকরণ, সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণসহ কৃষি গবেষণার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। স্বাধীনচেতা, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন সাহসী এই বিজ্ঞানী সকল প্রোটোকল ভেঙ্গে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর সাথে সরাসরি দেখা করে ফার্মগেটে পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত জমির বরাদ্দ বাতিল করিয়ে সেখানে কৃষি গবেষণা সিস্টেমের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, সমগ্র ফার্মগেট এলাকে কৃষি উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখেন।

বহুমাত্রিক শস্য গবেষণার জন্য ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮৩-৮৪ সালে বিএআরসি শক্তিশালীকরণ ও পুনর্গঠন করেন। একই সময়ে তিনি কৃষিতে উচ্চশিক্ষার জন্য গাজীপুরের সালনায় ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। কৃষি গবেষণার আর্কিটেক্ট হিসেবে পরিচিত দূরদর্শী এই বিজ্ঞানী বাংলাদেশের সকল জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম গড়ে তোলেন। তিনি মনের অজান্তেই তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে এই সিস্টেমের একটি অঙ্গে পরিণত হয়ে যান। তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), বাংলাদেশ সুগারকেন রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচারসহ (বিনা) সকল কৃষি বিষয়ক গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। যার ফলশ্রুতিতে দেশ আজ শস্য, শাক-সবজি, মৎস্য, ডিম, দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর কর্মকৌশল ও কর্মস্পৃহা চিরদিন কৃষি বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার (বাগ) প্রতিষ্ঠা

সুদক্ষ কৃষি উন্নয়ন সংগঠক ড. বদরুদ্দোজা অনেক বেসরকারি জনসেবামূলক কৃষি উন্নয়ন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল। সহজেই সকলকে সংগঠিত করতে পারতেন এবং কাজ-কর্মে সর্বদা সমন্বিত প্রয়াস গ্রহণ করতেন। স্বাভাবিক অবসরের পর কৃষির সকল ক্ষেত্র তথা- শস্য, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বন সেক্টরের অবসর প্রাপ্ত সিনিয়র কৃষিবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো ও তাঁদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার (বাগ) নামে একটি অলাভজনক কৃষি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি আমৃত্যু একাডেমির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আজীবন কৃষি উন্নয়নে অবদান রেখে গেছেন। বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার এর ভিশন ও মিশন এখানে তুলে ধরা সংগত বলে মনে করি। এদেশের মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, কৃষি পলিসি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা দান, কৃষির সকল উপখাতে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কৃষকের চাহিদার নিরিখে প্রকৃত সমাধানের পরামর্শ প্রদান; নীতিনির্ধারক, সম্প্রসারণ কর্মী ও বিজ্ঞানীদের কারিগরি পরামর্শ প্রদান; সেমিনার, কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে গবেষণা ও উন্নয়নের অগ্রাধিকার নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি জোরদারকরণ, কৃষি ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান, সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কারিগরি সহযোগিতা বিনিময় ও কর্ম যোগাযোগ স্থাপন-একাডেমির মূল লক্ষ্য।

একাডেমির নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে- ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ উপজেলার মহেশ্বর চাঁন্দা গ্রামে সেন্টার ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (কার্ড) নামে একটি মাঠ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজী স্যার কৃষকদের সংগঠিত করেন। প্রদর্শনী খামার স্থাপনসহ উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান এবং স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে তিনি মহেশ্বর চাঁন্দা গ্রামকে একটি আদর্শ গ্রামে রূপান্তর করেন। ফলে ঐ গ্রামে কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়, কৃষকের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটে। কাজী

স্যারের পরিকল্পনায় এটি বাগের একটি বড় সাফল্য। বাগের কারিগরি সহায়তায় মহেশ্বর চাঁন্দা গ্রামেই প্রথম ভার্মিকম্পোস্ট নামক জৈবসার তৈরি শুরু হয়। এই প্রযুক্তি সফল প্রমাণিত হওয়ায় পরে ঐ গ্রামে কমিউনিটিভিত্তিক বাণিজ্যিকভাবে ভার্মিকম্পোস্ট সার উৎপাদন শুরু হয়। ফলে রাসায়নিক সারের বিকল্প তৈরি হয়।

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ), কৃষি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং গবেষণা ও সম্প্রসারণ সংস্থাসমূহের মধ্যে নিবিড় কর্ম-সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে কাজী বদরুদ্দোজা স্যারের উদ্যোগে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহায়তায় 'Capacity building of some field level extension officers of DAE, DoF, DLS and progressive farmers of Bangladesh' শীর্ষক ৩ বছর মেয়াদি একটি প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৩ বছরে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৩৫০ জন মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও ১৫০ জন অগ্রসরমান কৃষকসহ মোট ১৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন ফসল, ফলমূল, শাক-সবজি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় গত ২ বছরে ১০৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এবছরে অবশিষ্ট ৪২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থী এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃপক্ষ আলোচ্য প্রশিক্ষণ খুবই ফলপ্রসূ হচ্ছে বলে আখ্যায়িত করেছেন। কাজী স্যার জীবদ্দশায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করে গেছেন যা একই ধারায় চলমান রয়েছে। ড. বদরুদ্দোজা স্যারের হাতে প্রতিষ্ঠিত এই একাডেমি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নিয়ে আগামীতে কৃষি উন্নয়নে আরো বেশি বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মাঠ পর্যায়ের উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণপূর্বক একাডেমি উন্নত প্রযুক্তির পাশাপাশি সনাতন প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করে আসছে। কৃষি ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃষক, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী, শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে একাডেমি প্রায় প্রতি বছর স্বর্ণপদক, ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করে থাকে। এসবই হয়েছে কাজী স্যারের পরিকল্পনায়।

কাজী স্যার একাডেমির মাধ্যমে অভিজ্ঞ দেশি-বিদেশি বিজ্ঞানী ও অংশীজনের সমন্বয়ে কৃষি উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন। সাম্প্রতিক কালে আয়োজিত এসব সেমিনারের মধ্যে বছরব্যাপী পুষ্টিকর ও উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদন, কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব; বাগ, বিএআরসি, সিমিট, বাংলাদেশ ভুট্টা সমিতি, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বয়ে বাংলাদেশে ভুট্টা উৎপাদন, উন্নয়ন এবং এর বহুমুখী ও বিকল্প ব্যবহার; বাগ, নাস, ইলরি ও সার্কের সমন্বয়ে 'দক্ষিণ এশিয়ায় ট্রান্সবাউন্ডারি ইনফেকশাস ডিজিজ ইন লাইভস্টক অ্যান্ড পোল্ট্রি' শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব সেমিনার/কর্মশালার প্রসিডিংস ও সুপারিশমালা যথারীতি প্রকাশপূর্বক তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।

কাজী স্যারের নেতৃত্বে একাডেমি নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক নানা বৈজ্ঞানিক বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশ করেছে। নিম্নে কতিপয় প্রকাশনার নাম উল্লেখ করা হলোঃ

Books

1. Indigenous Tecnologies of Agriculture in Bangladesh
2. Environment and Agricultural Productivity in Bangladesh
3. 100 Years of Agriculture in Bangladesh

Proceedings

1. Proceedings of the National Workshop on Year Round Production of Nutritious and High Value Fruits in Bangladesh
2. Proceedings of the Workshop on Public-Private Partnership in Agricultural R & D in Bangladesh
3. Proceedings of the Silver Jubilee Celebration of Bangladesh Academy of Agriculture
4. Recommendations of the Seminar on Year Round Production of High Value Nutritious Fruits in Bangladesh
5. Journal of Bangladesh Agriculture

ড. কাজী বদরুদ্দোজা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞানের ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এর সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে এর সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সকল খাতের সুষম উন্নয়নে বিজ্ঞানের ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তিনি বিজ্ঞান একাডেমির কার্যক্রম পরিচালনায় অবদান রাখেন।

খ্যাতনামা এই কৃষিবিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়নেও ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তিনি পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল (১৯৬০-৭০), এরিড জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব পিএআরসিসহ (১৯৬৮) কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ভিয়েতনাম (১৯৮৫-৮৮), ইনস্টিটিউট অব জেনেটিক্স রিসার্চ, হ্যানয়, ভিয়েতনাম এর প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠনে অবদান রেখেছেন। নেদারল্যান্ড এর হ্যাগ-এ অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস ফর ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ইজনার) প্রতিষ্ঠার জন্য সিজিআইএআর কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে তিনি ইজনার স্থাপন ও এর পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এছাড়াও তিনি আরো অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রথিতযশা এই কৃষিবিজ্ঞানী কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্য ও গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বাধীনতা পদকসহ অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর অনেক কারিগরি প্রকাশনা রয়েছে। পেশাগত সেমিনার ও কনফারেন্সে তিনি বহু কারিগরি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তিনি অনেক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ সভা ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন। ড. বদরুদ্দোজা পৃথিবীর বহু দেশ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন যার মধ্যে রয়েছেঃ ব্রাজিল, বুলগেরিয়া, চীন, মিশর, ভারত, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, লেবানন, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, পেরু, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ভিয়েতনাম, ইগোস্লাভিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ড. বদরুদ্দোজা এক ঐতিহ্যবাহী ও অভিজাত পরিবারের লিগেসি বহন করেন। তাঁর পূর্বপরুষ ভারতের মিরাট রাজ্যের নবাব পরিবারের বংশধর। তাঁর প্রপিতামহ ১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহি বিপ্লবের একজন অন্যতম সংগঠক ছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক নিহত হন। সীপাহী যুদ্ধ ব্যর্থ হলে তাঁর পিতামহ ব্রিটিশদের নিপীড়ন এমনকি মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে পালিয়ে যান। কিছুদিন পর কতিপয় মুসলিম হাজীদের আশ্রয়ে বর্তমান উত্তরবঙ্গের গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জের ঢোলভাঙ্গা গ্রামে এসে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন। তাঁর দাদা কলকাতা ক্যাম্বেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিকেল ডিগ্রি নিয়ে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ডাক্তারি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। পিতা বিশিষ্ট আইনজীবী কাজী বদিউজ্জামান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শাস্ত্রে ডিগ্রি নিয়ে গাইবান্ধায় আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। মাতার নাম জামিলা খাতুন। তাঁর মাতামহ মুনশি গওহর আলী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইনশাস্ত্রে বিএবিএল ডিগ্রি লাভ করে ১৮৬৯ সালে বগুড়া বারে আইন পেশায় যোগ দেন। তিনি ছিলেন বগুড়ার প্রথম মুসলিম আইনজীবী। মুনশি গওহর জনসেবামূলক কার্যক্রম তথা গণশিক্ষা, নারীশিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য বিশেষভাবে সুপরিচিত ছিলেন।

ড. বদরুদ্দোজা ১৯২৭ সালের ০১ জানুয়ারি বগুড়ায় মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। বড় হন গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জের ঢোলভাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত পিত্রালয়ে। তিন ভাই, তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জনক। বড় ছেলে কাজী মুরতাজা কবির লেমন উদ্ভিদ প্রজননে পিএইচডি, ছোট ছেলে ডা. কাজী সাজিউজ্জামান সনি যুক্তরাষ্ট্রে মেডিসিন (গেস্ট্রো-এন্টারোলজি) বিষয়ে চিকিৎসক এবং একমাত্র মেয়ে (সকলের ছোট) অধ্যাপক ডা. কাজী তাসনিম বদর যুক্তরাষ্ট্রে মেডিসিন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। বড় ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ছোট দুই ভাই বোন যুক্তরাষ্ট্রে ডাক্তারি পেশায় নিয়োজিত আছেন।

শিক্ষাজীবন

মেধাবী ছাত্র ড. কাজী বদরুদ্দোজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গাইবান্ধার

গোবিন্দগঞ্জে। তিনি ১৯৪২ সালে গোবিন্দগঞ্জ স্কুল থেকে ইংরেজিতে লেটার মার্কসসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কলেজ জীবনের প্রথমদিকে তিনি স্নেহময়ী মাকে হারান। কলেজ জীবন শেষে কৃষিকে জীবনের ব্রত করার লক্ষ্য নিয়ে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি রাজধানী শহর ঢাকায় চলে আসেন এবং উপমহাদেশের প্রথম কৃষি কলেজ তেজগাঁওস্থ বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং বিএজি ডিগ্রি লাভ করেন।

নিম্নে সংক্ষেপে তাঁর শিক্ষাজীবন তুলে ধরা হলো:

মেট্রিকুলেশন : গোবিন্দগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, গাইবান্ধা, ১৯৪২
আইএসসি : রাজশাহী সরকারি কলেজ, ১৯৪৪
বিএজি (ব্যাচেলর অব এগ্রিকালচার) : বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা (বর্তমান শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৪৮
এমএজি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২
পিএইচডি (ক্রপ বোটানি): লুজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৫৬
পোস্ট ডক্টরাল (উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব) : ল্যুন্ড ইউনিভার্সিটি, সুইডেন, ১৯৬০

কর্মজীবন

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী বরেণ্য এই কৃষিবিজ্ঞানী সারাজীবন কৃষি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি কর্মসূত্রে বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। পাকিস্তানের কৃষি গবেষণা সমন্বয়, তুলা উন্নয়ন এবং পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র যৌথ মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানের কৃষি উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর ধারাবাহিক কর্মজীবন নিম্নে প্রদত্ত হলো:

* রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, এগ্রিকালচারাল রিসার্চ লেবরেটরি, তেজগাঁও, ঢাকা, ১৯৪৮-১৯৫৬
* বিভাগীয় প্রধান, ইকোনমিক বোটানি ডিভিশন, বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৫৭-১৯৬৪
* সিনিয়র পরিচালক (রিসার্চ), পাকিস্তান কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ১৯৬৪-১৯৭১

* নির্বাহী পরিচালক, পাকিস্তান কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ১৯৭১-১৯৭৩
* পরিচালক কৃষি (গবেষণা ও শিক্ষা), ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৭৪-১৯৭৬
* প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৯৭৬-১৯৮৩
* নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ১৯৭৪-১৯৭৭
* নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান/চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ১৯৭৯-১৯৮৫
* প্রধান গবেষণা উপদেষ্টা, কৃষি গবেষণা প্রোগ্রাম, এফএও/ইউএনডিপি, হ্যানয়, ভিয়েতনাম, ১৯৮৫-১৯৮৮

গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার ও সম্মাননা

কৃষিতে অসাধারণ সাফল্য ও গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খ্যাতনামা কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাজী বদরুদ্দোজা অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার ও সম্মাননার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

* তমগা-ই-ইমতিয়াজ, ১৯৬৮ এবং তমগা-ই-পাকিস্তান, ১৯৬৯, পাকিস্তানের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বেসামরিক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার
* জেবুন্নেছা-কাজী মাহবুবুল্লাহ স্বর্ণপদক, ১৯৮৩
* ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট, জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৫
* বিএআরসি ও নার্সভূক্ত বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘ সময় এর সফল নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র, ১৯৮৫
* স্বর্ণপদক, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ১৯৯১
* জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য অনার অব ডিসটিংগুইশড সায়েন্টিস্ট এন্ড গবেষণা লিডার, কনসালটেটিভ গ্রুপ অন ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (সিজিআইএআর), বিশ্বব্যাংক, ১৯৯৯
* ডিএসসি (অনারিস কসা) ডিগ্রি, বিশ্ব উন্নয়ন সংসদ, ভারত
* কৃষি গবেষণায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার, ২০১০

* দেশের কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আজীবন সম্মাননা পুরস্কার, চ্যানেল আই স্যাটেলাইট টেলিভিশন ২০১০
* স্বাধীনতা পদক, সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় বেসামরিক পুরস্কার, বাংলাদেশ সরকার, ২০১২
* স্বর্ণপদক, রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আরডিএফ), ২০১২
* চ্যানেল আই-স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কৃষিপদক, ২০২০
* ড. এম ও গণি মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস

এছাড়াও তিনি আরো বেশকিছু সংখ্যক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান থেকে পদক ও সম্মাননা পেয়েছেন যার মধ্যে রয়েছে-
বাংলাদেশ হর্টিকালচার সোসাইটি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গবেষণা কাউন্সিল, প্ল্যান্ট ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, আবু হোসেন সরকার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ইত্যাদি।

পেশাজীবী সোসাইটি/সমিতি/সংস্থার চেয়ারম্যান/সদস্যতা

বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ড. বদরুদ্দোজা বিভিন্ন সময়ে বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেশাজীবী সোসাইটি, কমিটি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য, চেয়ারম্যান, সমন্বয়ক কিংবা অন্যান্য দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এরূপ বেশ কিছু সোসাইটি/সংস্থার সদস্যতার তালিকা নিম্নে বর্ণিত হল :

* প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, রিজিওনাল কোঅর্ডিনেশন সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব কোর্স গ্রেইনস, পালসেস, রুটস এন্ড টিউবার ক্রপস ইন হিউমিড ট্রপিকস অব এশিয়া এন্ড দি প্যাসিফিক, বগর, ইন্দোনেশিয়া
* প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস ফর ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ইজনার), হ্যাগ, নেদারল্যান্ডস (১৯৭৯-৮৪)
* সদস্য, এডভাইজারি কমিটি অব ট্রপিক্যাল প্রোডাক্টস ইনস্টিটিউট (টিপিআই), লন্ডন (১৯৭৭-৭৯)

* সদস্য, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
* কান্ট্রি কোঅর্ডিনেটর, এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট ফর এশিয়া
* সদস্য, কনসাল্টেশন গ্রুপ অব এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন ব্যাংক ফর এশিয়া (আইবা)
* সদস্য, টাস্কফোর্স, কনসালটেটিভ গ্রুপ অন ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (সিজিআইএআর)
* সদস্য, কুইনকিনিয়েল রিভিউ টিম অব দি ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইরি), ম্যানিলা, ফিলিপাইন, ১৯৮৭
* প্রথম চেয়ারম্যান, এগ্রিকালচারাল গ্রুপ অব দি সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন (সার্ক)
* সদস্য, পাকিস্তান-আমেরিকান জয়েন্ট এগ্রিকালচারাল ইভালুয়েশন টিম (১৯৬৮)
* সদস্য, সেন্ট্রাল কটন কমিটি, পাকিস্তান (১৯৬৮)
* সদস্য, এগ্রিকালচারাল রিসোর্স কোর্ডিনেশন বোর্ড, পাকিস্তান (১৯৬৪-৭১)
* প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স, ১৯৭৮
* প্রেসিডেন্ট, এগ্রিকালচার, এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি এন্ড ফরেস্ট্রি সেকশন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স, ১৯৭৫
* সদস্য, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস, ১৯৮৩
* সদস্য, এডভাইজারি বোর্ড, বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি কমিশন (১৯৮০-৮৪)
* সেক্রেটারি, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস, ১৯৮৪-৮৫
* সদস্য, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি
* প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার, (১৯৯৩-২০২৩)
* সদস্য, পেস্টিসাইড টেকনিক্যাল কমিটি, বাংলাদেশ সরকার
* চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় ইউনিয়ন লি. (মিল্ক-ভিটা)
* পরিচালক, ব্যবস্থাপনা বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক
* চেয়ারম্যান, ইন্টারন্যাশনাল লাইফ সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ
* সদস্য, সিন্ডিকেট/সিনেট, বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের প্রাণপুরুষ ড. বদরুদ্দোজা এদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন নিয়েই সারাক্ষণ ভাবতেন। তিনি ছিলেন এদেশের কৃষির অভিভাবক। ৯৭ বছরের জীবনের শেষ সময়টাতেও তিনি কৃষির সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তাঁর মাধ্যমেই এদেশে কৃষি উন্নয়নের সূচনা। তিনি আধুনিক কৃষির প্রবর্তক ও কৃষি উন্নয়নের পথ প্রদর্শক। তাঁরই নেতৃত্বে দেশে বহু শস্য, শাক-সবজি, ফলমূলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবিত হয়েছে এবং কৃষিতে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তিনি বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্টসহ আমৃত্যু এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে ড. বদরুদ্দোজার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর কর্মস্পৃহা, স্বপ্ন ও আদর্শকে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করাই হবে তাঁর প্রতি কৃষিবিদদের প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করা।

কীর্তিমান এই কৃষিবিজ্ঞানীর মৃত্যু দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। গুণী এই বিজ্ঞানীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাকসহ আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা শোক প্রকাশ করেছেন। আমরা প্রয়াত ড. বদরুদ্দোজার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

তথ্যসূত্র : ১. কৃষি ও কৃষকের প্রাণ ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা
সম্পাদক: মঞ্জু আরা বেগম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০২১
২. বায়োগ্রাফি অফ ফেলো'স অব দি
বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস, ১৯৭৩-২০২১
৩. বিএআরআই ও বিএআরসি'র কার্যকাল তালিকা বোর্ড

লেখক : সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার

অদৃশ্য সূতোর টান
ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

বয়সের বিস্তর ফারাক ছিল তাঁর সঙ্গে আমার। কম করে হলেও ব্যবধানটা ছিল আটাশ বছরের। আমি যখন প্রভাষক হিসাবে উনিশশ' তিরাশীতে বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট (বিএআই)-এ যোগদান করি তখন তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)-এর প্রধান অর্থাৎ পরিচালক ছিলেন। বলা বাহুল্য বিএআই-এর প্রশাসনিক দেখভাল করার দায়িত্ব তখন বিএআরআই-এর ওপর ন্যস্ত ছিল বলে তিনি আমার এমপ্লয়ারও ছিলেন। এসব তথ্য থেকে আমাদের সম্পর্কের দূরত্বটা সহজেই হয়ত আঁচ করা যাবে। আমার চাকুরিতে যোগদানের এক বছরের মধ্যেই তিনি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ফলে চাকুরিকালে তাঁর সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠার কোনো সুযোগই ছিল না আমার। বলছি এদেশের কৃষির এক কিংবদন্তিতুল্য বিজ্ঞানী ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার সাথে আমার সম্পর্কের তখনকার অবস্থার কথা। তবে আনন্দের কথা এই যে, বেশ খানিক বিলম্বে হলেও আমার সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাঁর সানুগ্রহ মনোযোগ আমি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম একবিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকেই। আর তা ঘটেছিল মূলত আমার বিজ্ঞান লেখালেখি আর পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃত্বের সুবাদে। আমার লেখা গ্রন্থের সৌজন্য কপি প্রায়শই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতাম বা নিজে দিয়ে আসতাম। তিনি এসব বই উল্টে পাল্টে দেখতেন। লেখালেখি চালিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দিতেন। তাছাড়া বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও পরে সভাপতি থাকাকালীন সময় আমাদের সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে একাধিকবার তাঁকে আমি অতিথি করে নিয়ে এসেছিলাম। এতে আমার কথাবার্তা, সাংগঠনিক দক্ষতাও তাঁর নজর কাড়ে। এসবের মধ্য দিয়ে অদৃশ্য এক সূতো ক্রম বিস্তার লাভ করতে শুরু করে।

সেটি ২০০৯ সাল। আমি বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতির সভাপতি। তিনি তখন বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার-এর সভাপতি। দুই সমিতির কয়েকজন নেতৃবৃন্দ একত্রে বসে যৌথভাবে প্রথম বারের মত

আমরা 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন প্ল্যান্ট ব্রিডিং এন্ড সীড ফর ফুড সিকিউরিটি' শিরোনামের তিনদিনের আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিই। বদরুদ্দোজা স্যারকে কনফারেন্সের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি করা হয় আর আমাকে এর সদস্য সচিবের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। হুট করেই এতে তিন দশকের ব্যবধান যেন অনেকটাই ঘুচে যায়। আমরা পরস্পর সে কনফারেন্সের সুবাদে অনেক কাছে এসে যাই। তাঁর সাথে বিএআরসিতে তাঁর কক্ষে বসে কনফারেন্সের প্রস্তুতি নিয়ে প্রায়ই আমাদের বসতে হতো। হঠাৎ একদিন তিনি প্রশ্ন করলেন- কারা মূল অনুষ্ঠানটার উপস্থাপনা করবে। একজন স্মার্ট ছেলে ও একজন মেয়েকে দায়িত্ব দিয়েছি এবং রিহার্সাল করিয়ে নিয়েছি শুনে তিনি খুশী হলেন। জানতে চাইলেন গেস্টদের ওয়াশরুম ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে কিনা। কত খুঁটিনাটি ছোটো খাটো এবং অতি আবশ্যিক বিষয় নিয়ে তিনি ভাবছেন ভেবে অবাক হয়েছিলাম। যা হোক সেটি ছিল আমার দেখা তিন দিনের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের সবচেয়ে সফল আয়োজন। এমনকি শেষ দিনেও দু' আড়াই শ' পার্টিসিপেন্টস ছিল বিএআরসি কনফারেন্স কক্ষে। দশবারো জন বিদেশি গবেষকও যোগ দিয়েছিলেন এতে। মোট ৩৪টি পেপার তিন দিনে উপস্থাপিত হয়েছিল। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বেশ ক'জন বিদেশি গবেষকের আসা যাওয়া স্পন্সর করেছিলো। কনফারেন্সটির ২৬৭ পৃষ্ঠার একটি প্রসিডিংসও ছাপানো হয়েছিল আমার আর ড. লুৎফর রহমান স্যারের সম্পাদনায়।

২০০৮ সালে বাংলা একাডেমি থেকে আমার তৃতীয় গ্রন্থ 'জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফসল; বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' প্রকাশিত হয়েছিল। এর একটি কপি বদরুদ্দোজা স্যারকে দিয়েছিলাম। বইটি দেখে তিনি এত খুশি হয়েছিলেন যে, এটিকে আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করি সেটা তিনি চেয়েছিলেন। ২০০৯ সালে বিএআরসিতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে উপস্থিত 'বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স'-এর সভাপতি ড. মোঃ শমসের আলীকে তিনি বইটি দেখিয়ে এর ইংরেজি অনুবাদটি যেন তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশ করেন সে জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ড. আলী তখনই হ্যাঁ-বোধক ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন। আমার ব্যস্ততার জন্য সে কাজটি আমি আর করে উঠতে পারিনি বটে, তবে আমাদের পরস্পরের অদৃশ্য সূতোর টান ততদিনে আরো

খানিক গাঢ় হয়ে উঠেছিল।

২০১৬ সালে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার এর পক্ষ থেকে আমার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী চাওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি আমাকে আমার কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখির মাধ্যমে কৃষিতে অবদান রাখার কারণে একটি এওয়ার্ড প্রদান করবে বলে জানায়। এর পেছনে যে কাজী স্যারের একটি সমর্থন আছে সেটি অনুমান করতে পারলাম। নির্ধারিত দিনে আমন্ত্রণক্রমে আমি প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। সভার এক পর্যায়ে আমাদের ৪ (চার) জনকে স্ব স্ব কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৬ সালের একাডেমি এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। আমার জন্য তা কিছুটা বেশি মর্যাদাপূর্ণ ছিল বিশেষ একটি কারণে। আমাকে প্রদত্ত সম্মাননাটি ছিল ‘ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা ট্রাস্ট ফান্ড গোল্ড মেডেল’। কাজী স্যারের নামাঙ্কিত সে মেডেলের একটি আলাদা মর্যাদা ছিল। যেন সম্পর্কের সূতোটি অলক্ষ্যেই আরো বেশ খানিক দৃঢ়তর হতে থাকলো।

২০১৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় আমাকে ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২২ (স্বর্ণপদক)’ প্রদান করে। কৃষি উন্নয়নে আমার লেখা গ্রন্থ, প্রবন্ধ আর বিভিন্ন রকম কৃষি বিষয়ক সম্প্রচারের মাধ্যমে কৃষিতে অবদানের জন্য আমাকে এই পদকটি দেওয়া হয়। তিনি এ খবর পেয়ে ভীষণ খুশী হন। আমাকে ধন্যবাদও জানান। বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার-এর এক অনুষ্ঠানে তিনি আমাকে এ বিষয়ে আমার অনুভূতি জানাতে বলেছিলেন। আমি তা ব্যক্ত করার পর মুহুর্মুহু হাততালিতে এর প্রতি এক প্রকার সমর্থনই জানানো হয়। মানুষকে প্রাণিত করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর সাথে যারাই মিলেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়টি জানার সুযোগ ঘটেছে।

২০১৭ সালে বিএআরসি এর অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন সমিতি যুগপৎ আমার জাতীয় পদক প্রাপ্তির জন্য সম্বর্ধনা এবং আমার দু’টি গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করে। সে অনুষ্ঠানে কাজী স্যার ছিলেন প্রধান অতিথি। উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. সাত্তার মন্ডল, প্রফেসর ড. লুৎফর রহমান, প্রফেসর ড. শাহ-ই-আলম, ড. নিতিশ চন্দ্র দেবনাথ,

ড. ওয়ায়েস কবীরসহ সমিতির অনেক প্রবীণ ও নবীন সদস্য। সে অনুষ্ঠানে আমার স্ত্রী জিন্নাতুন নাহার শাহানা, অতিরিক্ত সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও আমার দু’সন্তান উপস্থিত ছিল। সেখানেই কাজী স্যারের সাথে আমার স্ত্রীর পরিচয় ঘটে। আমার স্ত্রীর সাথে বেশ কতক্ষণ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কাজী স্যারের প্রতি আমার স্ত্রীর শ্রদ্ধা এবং সৌজন্যবোধ তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এরপর স্যারের সাথে যখনই কথা হতো তিনি আমার স্ত্রীর ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করতেন। সেবার সে অনুষ্ঠানে কাজী স্যার ঘোষণা দিলেন যে, ‘ভূঁইয়া, যেদিন তোমার পঁচিশটি বই লেখা শেষ করবে সেদিন তোমাকে আমি আরেকটি গোল্ড মেডেল দেব।’ এর চেয়ে বড় প্রেরণা আর কিছু হয় না। ইতোমধ্যে আমার গ্রন্থ সংখ্যা বত্রিশ ছাড়িয়েছে। কিন্তু সে কথা এক দিনের জন্যও তাঁকে আমি জানাইনি। কারণ আরেকটি গোল্ড মেডেলের চেয়ে তাঁর পিতৃতুল্য স্নেহ আমার বড় বেশী প্রয়োজন ছিল। নিখাদ স্নেহ যা মানুষকে সৃষ্টির জন্য তাড়িত করে সেটি ভীষণ রকম অনুভব করতে পেরেছিলাম।

সালটা ঠিক মনে নেই। ২০১৩ বা ২০১৪ হবে। হঠাৎ আমাকে টেলিফোন করলেন একাডেমির এখলাস সাহেব। বললেন কাজী স্যার আমার সাথে কথা বলবেন। মোবাইল ফোনটা কানে লাগালাম। তাঁর কথার সারমর্ম এই যে, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন তাঁকে একটি সম্মাননা স্মারক প্রদান করবে। শিক্ষা মন্ত্রী সে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন। কাজী স্যারের পক্ষ থেকে আমি যেন সে স্মারকটি গ্রহণ করি তিনি তা এসোসিয়েশনের কর্তা ব্যক্তিদের জানিয়েছেন। সেটি টেলিফোন করে আমাকে জানালেন। আমার আর কোনো উপায় থাকলো না সে অনুষ্ঠানে না গিয়ে। অথচ অনুষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিরা আমাকে সেখানে তো দাওয়াতই দেয়নি। ফলে বেশ একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। রাতের বেলা আমার অফিসের বসার কক্ষে এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি আমাকে অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতে এলো। ফলে সে যাত্রায় আমার মান রক্ষা হলো, তাঁর চেয়ে বড় কথা তাঁর পক্ষে আমি সে সম্মাননা গ্রহণ করলাম। স্যার মনে প্রাণে চাইতেন আমি যেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ লাভ করি। দেখা হলেই বলতেন তোমার ভিসি হওয়ার কতদূর। মাঝে মাঝে হঠাৎ আমাকে টেলিফোন করলেও এ কথা জিজ্ঞেস করতেন। এ রকম আরো দু-চার জন সিনিয়র কৃষিবিদ আমাকে এ

বিষয়ে প্রায়শই জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তারাও চাইতেন আমি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ লাভ করি। আমার প্রতি তাঁদের স্নেহের তুলনা হয় না। সেসব আমার জন্য বড় রকম প্রেরণা ছিল কাজ করার, গতিশীল থাকার এবং নিজেকে আপডেট রাখার। বলা বাহুল্য, এতে আমার বিরল সম্মানও মিলেছে। বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতির গত অর্ধযুগে অনুষ্ঠিত তিনটি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের কনফারেন্সের তিনটি মূল প্রবন্ধ আমাকেই উপস্থাপন করার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে।

এদেশের কৃষি গবেষণার সাথে জড়িত একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার পেছনে কাজী স্যারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার কথা অনেকেরই জানা। আমি জানি এসব কথা অনেকেই লিখবেন। সে কারণে অন্য একটি বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তাঁর অবসর জীবনের এক সময় এসে দেশে একটি জাতীয় কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট স্থাপনের স্বপ্ন জাগে তাঁর মনে। অনেক দূর এগিয়েছিল সে স্বপ্ন এক সময়। আমাদেরই কারো কারো নেতিবাচক ভূমিকায় শেষ পর্যন্ত সে প্রতিষ্ঠান এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এ বিষয়ে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য যেমন, তেমনি দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতির সভাপতি হিসাবে আমি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের সভাপতিকে পত্র প্রেরণ করি এবং সভাপতি কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের সাথে কথা বলি। আমি তখন কেআইবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচিত সদস্যও ছিলাম। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আমার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং দ্রুত কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সে পত্রটি দ্রুতই মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। অতঃপর আমাকে সভাপতি করে কৃষি মন্ত্রণালয় এরকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ১৪ - সদস্য বিশিষ্ট খসড়া আইন প্রণয়ন কমিটি গঠন করে দেয়। আমরা সে আইনের খসড়া দ্রুততম সময়ে দাঁড় করিয়ে মন্ত্রণালয়ে জমা দিই। একাধিক সভাও হয় এ মন্ত্রণালয়ে। একটি দু'টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভাও অনুষ্ঠিত হয়। তারপর আবার সব থেমে যায়। আনন্দের কথা এখন আবার এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরির খসড়া আইনটিকে চূড়ান্ত রূপ দেবার কাজ হচ্ছে। যদি এই আইনটি পাশ হয় এবং একটা জাতীয় কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা সম্ভব হয় তবে ড. কাজী বদরুদ্দোজা স্যারের লালিত স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করবে। তাঁর

সাথে সাথে আমাদের চাওয়াটা একটি পরিপূর্ণ রূপ পাবে। এর ভেতর দিয়ে আমরা তাঁকে বার বার স্মরণ করার সুযোগ পাবো।

শেষবার তাঁর সাথে আমার দেখা হয় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র কনফারেন্স কক্ষে। ২০২৩ সালের ১৯ মার্চ। বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার-এর বার্ষিক সাধারণ সভায়। এখানে এই অনুষ্ঠানটি করার জন্য একাডেমী কর্তৃপক্ষের আগ্রহ প্রকাশ করা মাত্রই আমি তাতে সম্মতি জানিয়েছিলাম। সে অনুষ্ঠানে আমি বদরুদ্দোজা স্যারের পাশাপাশি বসেছিলাম। স্যারকে আমার স্ত্রীর অসুস্থতার কথা বলতেই তিনি আমাকে আমার স্ত্রীর পাশে চলে যেতে বললেন। একাধিকবার তিনি আমাকে তাড়া দেন। আমি কনফারেন্সে উপস্থিত এতগুলো সিনিয়র কৃষিবিদদের ছেড়ে আসতে দ্বিধাবোধ করছিলাম। এক পর্যায়ে স্যারের হাতটা ধরে রেখে বড় আন্তরিক পরিবেশে তাঁর নানা রকম খোঁজ নিচ্ছিলাম। সেসব ছবি এখন মনকে বড় নাড়া দেয়। আমার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ভারতে থাকায় তাঁর সাথে আর আমার দেখা হয়নি। সে কষ্ট বুকে বাজে। এত স্নেহ যার পেয়েছি সে মানুষটাকে শেষ দেখা দেখতে পারিনি। স্যারের মৃত্যুর খবর শুনে আমার অসুস্থ স্ত্রীর মুখ বড় ম্লান হয়ে গিয়েছিল। এর দু'মাস পর আমার স্ত্রীও আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন। প্রিয় মানুষদের তিরোধান আমাকে বড় বেদনার্ত করে তোলে। শেরে-ই-কাশ্মির ইউনির্ভাসিটি অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস এন্ড টেকনোলজি ভার্সিটিতে 'এগ্রিকালচারাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল টেকনলোজি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি অব উত্তরাখণ্ড, ইন্ডিয়া' প্ল্যান্ট ব্রিডিংয়ে অবদানের জন্য আমাকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করে। সে সুখবরটা সামনাসামনি তাঁকে দেবো ভেবেছিলাম। তাও সম্ভব হলো না।

আশ্চর্য একটা মায়া ছিল তাঁর। কাছে টানবার এবং তা ক্রমাগত অব্যাহত রাখার। সে টানে তাঁর বহু গুণমুগ্ধ তৈরি হয়েছিল। শ্রদ্ধা আদায় করে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতাও ছিল তাঁর। দেশ নিয়ে বিশেষত কৃষি নিয়ে নিরন্তর ভাবনায় আচ্ছন্ন এক মানুষ ছিলেন তিনি। এর জন্য অনেক সম্মাননা পেয়েছেন। পেয়েছেন কত রাষ্ট্রীয় পদকও। পেয়েছেন এদেশের গবেষক ও কৃষকদের মন উজাড় করা ভালোবাসাও। সেসবই শেষ জীবনে একা এই মানুষটার বড় অবলম্বন ছিল। মেধা মননে চিন্তা-চেতনায় ছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত আধুনিক।

তিনি এদেশের কৃষির এক কিংবদন্তি। এদেশের কৃষি রূপান্তরের এক কারিগর। তিনি আমাদের প্রিয় মানুষ ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা। মৃত্যুর এপার থেকে পিতৃতুল্য এই বিজ্ঞানীর জন্য পরম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং অশেষ শুভ কামনা।

লেখক : সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Kazi M. Badruddoza: The iconic figure of designing inclusive agricultural research and development in Bangladesh

Professor Lutfur Rahman, PhD

During my first meeting with Dr. Kazi M. Badruddoza in early 1962, as a student at the East Pakistan Agricultural Institute (EPAI) in Dhaka, we discussed the professional status of agricultural graduates compared to medical and engineering graduates. At that time, Late Yeasin Ali Bhai, an M.Ag student, guided us, the new entrants on the professional inadequacies we faced.

As first-year students, we attended Zoology, Botany, Soil Science, and Physics classes at various departments of Dhaka University, Curzon Hall Campus. One day, we skipped classes to visit the Morning News office, demanding publication of our plea for equal professional status with engineering and medical graduates. This led to a procession to the historic Amtala of the University and finally back to the hostel in Tejgaon. These actions resulted in the arrest of ten students by SP Hafiz after an identification parade at the hostel, now Sher-e-Bangla Hostel of the Sher-e-Bangla Agricultural University (SAU).

We sought support from senior agricultural graduates, including our teachers at the EPAI. We contacted Professor Mosleh Uddin Ahmed, Dr. A.H.M. Altaf Ali, Dr. S.M. Hasanuzzaman, Dr. Kazi M. Badruddoza, and Dr. Mohammad Abdul Quader (who was Deputy Director of Agriculture at the secretariat). For bail, we relied on Advocate Ataur Rahman Khan, a former Chief Minister of the province, since the Principal refused to act as a guardian due to external pressure. We got bail of our friends approved. After that with the help of Advocate Golam Hafiz of the Supreme Court, we filed a court case in the High Court against the Morning News, which had portrayed us as criminals and eventually, our friends were exonerated. We also have had joint programs with

students of the EPAU during their 172-day strike on the demand.

From this experience, I learned three key lessons:

1. The Role of Teachers and Vice-Chancellors: Teachers and vice-chancellors are crucial in safeguarding students. Our Zoology teacher, Mr. Abdul Wahed Khan of Dhaka University, supported our cause and informed the IGP through the SP that we were not involved in damaging the Morning News office. Similarly, the Vice-Chancellor, Dr. Mohamud Hossain, intervened on our behalf, ensuring we were treated honorably. I applied this lesson during my tenure as a university teacher.

2. Timing and Planning: Effective planning and execution require identifying the best time and situation. Dr. Badruddoza subtly emphasized this point during a discussion with Professor Mosleh Uddin Ahmed and me. We remained committed to our goals, understanding the importance of timing, especially when representing students from two universities—one in Mymensingh and the other in Dhaka.

3. Strategic Decision-Making: When EPAU students decided to end the strike, we, at EPAI, felt it was premature, but agreed to attend classes. Our Principal, Mr. Farid Uddin Ahmed, fully supported us, even against the Director of Agriculture, Mr. Hazarika's, recommendation to expel some students. This support was crucial in navigating the challenges we faced.

In June 1965, I joined the East Pakistan Agricultural University (EPAU) as a Master’s student in the Department of Agronomy, with the Dean as my supervisor. During this period, I lost contact with Dr. Badruddoza but maintained connections with Dr. Hasanuzzaman, Mr. Mosleh Uddin Ahmed, and Mr. Yeasin Ali. Mr Yeasin was my mentor and helped me understand the intricacies of the agricultural profession. In July 1972, after

completing my PhD studies and joining the Department at the Bangladesh Agricultural University (BAU), I reconnected with my senior colleagues.

By 1974, Dr. Badruddoza had become the Executive Vice-Chairman of the Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) and the Director of the Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI). I often visited him while attending sub-committee meetings for the First Five-Year Plan on oilseeds and pulses, and as a member of the Offshore Development Committee of the Planning Commission.

In late 1974, I met Dr. Badruddoza along with the late Dr. Abdur Rahim, the then Director of Nutrition at BARC. Dr. Badruddoza inquired about the possibility of introducing soybeans in Bangladesh, knowing that I was working on oilseeds and soybeans at BAU in collaboration with the Mennonite Central Committee. I responded positively, emphasizing the need for an all-inclusive R&D project to cover the entire spectrum of technology generation, testing, and adoption due to the crop's novelty and its industrial and home-use potentials.

Dr. Badruddoza kindly accepted my suggestion, leading to the establishment of the Bangladesh Coordinated Soybean Research Project, the first of its kind in the country. This project coordinated efforts among experts from eleven departments across four ministries, including one NGO and a private food company. The main players were Bangladesh Agricultural University (BAU), Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR), Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), Bangladesh Rice Research Institute (BRRI), Bangladesh Sugarcane Research Institute (BSRI), Rajshahi University (RU), Mennonite Central Committee (MCC), and Shilpee Food Products. The impact of this coordinated approach is evident today, with increased soybean acreage and production, and a reduction in imports of poultry and livestock feeds.

Through that project, Dr. Kazi M. Badruddoza pioneered a comprehensive coordination approach, bringing together experts from various organizations to solve problems collaboratively. This coordination and linkage of agricultural education, research, and extension were pivotal to the country's R&D efforts, embodying his core idea and concept. However, he struggled to align his colleagues with the system of coordinated R&D projects as seen in India through the ICAR. Instead, they followed an individual approach within the NARS institutes, leading to a lack of coordination and fragmented knowledge and technology development.

Dr. Badruddoza also envisioned placing BAU under the Ministry of Agriculture, similar to the system in Japan. This approach failed due to the existing system under the Ministry of Education, which included the Chancellor's Secretariat, the President of the country, and the University Grants Commission. Additionally, the Ministry of Agriculture's insufficient understanding of university operations hindered this vision. Nevertheless, he managed to organize R&D institutions across various ministries under the coordination and somewhat control of BARC, the apex body for agricultural R&D.

His vision for controlling plant and biogenetic resources to prevent bio-piracy and genetic erosion through systematic studies, conservation, characterization, documentation, and use was not fully realized. He aimed to protect genetic resources while facilitating their use and sharing through established GI numbers. In 1997, as Chair of the National Committee on Plant Genetic Resources (NCPGR) at the Ministry of Agriculture, he initiated efforts to establish the National Institute of Plant Genetic Resources. However, the necessary legislation has yet to be enacted by Parliament, and the institute remains unrealized as of 2024. Consequently, several agricultural plant products that could have been established as uniquely Bangladeshi with GI numbers are instead being taken and appropriated as their own by neighboring India.

Dr. Badruddoza served as a Syndicate member of BAU as an ex-officio, as he was the Director of BARI, a position created at the founding of EPAU (later renamed BAU after the 1971 liberation). He strongly supported the development of new fields of study within various faculties and advocated for linking R&D activities with education through Bangladesh Agricultural University Research System (BAURES), Bangladesh Agricultural University Extension Centre (BAUEC), and the Graduate Training Institute (GTI) of BAU. During this period, he also supported establishing the Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) and Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI) within BAU Campus, reflecting his vision to integrate these institutes' activities with university faculties and students. These insights are based on my personal communications with Dr. Kazi M. Badruddoza over the years, as I remained closely connected with him until his retirement and beyond, up to his last day.

Dr. Kazi M. Badruddoza was a visionary leader who sought to innovate and reform agricultural research, education, and extension services. Unlike a dictator, he did not merely follow ministry directives but instead championed an inclusive system for agricultural disciplines. Unfortunately, his successors at BARC did not fully grasp the potential of his ideas, particularly his integrated approach to education, research, extension, and market research. His vision aimed to addressing the grassroots needs of farmers and producers, promoting knowledge sharing and inclusivity.

Dr. Badruddoza endeavored to promote his vision through establishing the Bangladesh Academy of Agriculture (BAAG), where he served as the President. Despite his efforts, many of us, especially the fellows of BAAG, failed to provide the needed support he anticipated. We now regret not fully realizing his vision.

On a personal level, Dr. Badruddoza was deeply committed to fostering familial bonds, not only within his family but also among

professional associates from crops, livestock, fisheries, forestry and agricultural economics. This close-knit relationship extended to my family through his friendship with the late Dr. Amiruddin Ahmed, my wife's brother-in-law. As a result, my wife and I became very close to Dr. Badruddoza and his family. I even had the privilege of teaching his son, Murtuza Kazi Lemon, at BAU, where my wife and I acted as his guardians. Dr. Badruddoza's dedication to Lemon’s well-being was unwavering throughout his career in Bangladesh.

Dr. Badruddoza also supported our family trust, the Resource Development Foundation (RDF), which assists students in need and awards those contributing significantly to agriculture. He honored us by accepting the "Gold Medal Award 2012" from RDF and generously donated the award money to the Halima-Habib Academy in Bhanga, Faridpur.

In tribute to Dr. Badruddoza's legacy, let us strive, individually and collectively, to support the agrarian community with effective R&D knowledge and appropriate technology for production, processing, and market organization. I hope this memoir on Dr. Kazi M. Badruddoza offers insights into his visionary approach and dedication in advancing the agricultural profession in Bangladesh.

Author : Former Professor, Bangladesh Agricultural University
President, Bangladesh Academy of Agriculture

বাংলাদেশের কৃষি বিনির্মাণের কারিগরঃ ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা

কৃষিবিদ ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার

কীর্তিমানের মৃত্যু নেই। সেজন্য যাঁরা কীর্তিমান তাঁরা মানব কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে মানব সমাজে বেঁচে থাকেন যুগের পর যুগ। হয়ে উঠেন কিংবদন্তি। মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এসব কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গের জীবনাদর্শই যুগ যুগ ধরে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। সামনে এগোনোর ও মানব কল্যাণে নিজেদেরকে উৎসর্গ করার এরকমই একজন কীর্তিমান কৃষি ব্যক্তিত্ব আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ইমেরিটাস সাইন্টিস্ট ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষি বিজ্ঞানী। তিনি এ দেশের লাখো ক্ষুধার্ত মানুষকে বাঁচাতে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। ছাত্রজীবনে বরাবরই এই মেধাবী মানুষটির ব্রতই ছিল কীভাবে এ দেশের মানুষের খাদ্যের চাহিদা নিশ্চিত করা যায়। আর তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন একজন কৃষি বিজ্ঞানী হওয়ার। হয়ত ১৯৪৩-এর মন্বন্তর তাঁকে প্রস্তুত করেছিল পেশাটিকে বেছে নেওয়ার জন্য।

বাংলাদেশের কৃষিকে সনাতনী থেকে বিজ্ঞান ভিত্তিক ও আধুনিক ধারায় রূপান্তরের প্রথম কারিগর ছিলেন তিনি। দানাদার নির্ভর কৃষি থেকে তিনি সবজি ও ফলমূল উৎপাদন বাড়ানোয় ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে শুরু করে কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের মতো বুনিয়াদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যার সুফল দেশের মানুষ এখন ভোগ করছে। আমরা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি আমাদের প্রিয় ড. কাজী বদরুদ্দোজা স্যার কৃষি ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম সারির কিংবদন্তির মধ্যে একজন। তিনি কৃষিবিজ্ঞানী এবং কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক কিংবদন্তি হিসেবে স্বীকৃত। সবুজ বিপ্লবের জনক হিসেবে খ্যাত বিখ্যাত মার্কিন কৃষি বিজ্ঞানী এবং শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. নরম্যান ই. বোরলগ (Dr. Norman E. Borlaug) এবং ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক ড. এম. এস. স্বামীনাথান (Dr. M. S. Swaminathan) এর সাথে ড. কাজী বদরুদ্দোজা ঘনিষ্ঠভাবে সবুজ বিপ্লবে জড়িত ছিলেন।

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের বর্তমান বগুড়া জেলায় ১লা জানুয়ারি ড. কাজী বদরুদ্দোজার জন্ম এবং বেড়ে উঠা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের অধীনে বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট (বর্তমানে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে বিএজি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএজি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে আমেরিকা গমন এবং ১৯৫৬ সালে আমেরিকার লুজিয়ানা ইউনির্ভাসিটি (Louisiana State University of USA) থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৬০ সালে পোস্ট ডক্টরাল করেন সুইডেনের লুন্ড ইউনির্ভাসিটি (Lund University of Sweden) থেকে। দেশে ফিরে তিনি কৃষি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

বর্ষীয়ান এই কৃষি বিজ্ঞানী তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে মেধা ও পরিশ্রমের দ্বারা বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি পাকিস্তান কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করে বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও পরে মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল এবং ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার এর সভাপতি ও বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

বাংলাদেশে কৃষির যে অবকাঠামো দেখা যায় তাঁর বেশির ভাগই ড. কাজী বদরুদ্দোজার সক্রিয় উদ্যোগের ফসল। আজকের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মূলত তাঁর চিন্তার ফসল। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হলে সবার আগে কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের সকল কৃষি বিষয়ক সংস্থার সমন্বয়ের জন্য তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল স্থাপিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর প্রচেষ্টায় তৈরি হয় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই),

বাংলাদেশ ফিসারিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এবং ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা), গাজীপুর। তাঁর নেতৃত্বে ইপসা ১৯৯৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআইএনএ) পুনর্গঠন করেন। তিনি বিদেশেও কিছু প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়তা করেন যেমন- ভিয়েতনাম জেনেটিক্স ইনস্টিটিউট, পাকিস্তানের আরিড জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইত্যাদি।

তিনি বাংলাদেশে নতুন ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ বিজ্ঞানীদের খুব বেশি চিনে না। তবে ড. কাজী বদরুদ্দোজার নাম সকলেই জানে। তার প্রধান কারণ হলো কাজী পেয়ারা। কাজী পেয়ারা সরাসরি ড. বদরুদ্দোজা উদ্ভাবন না করলেও এ পেয়ারার জাতটি উদ্ভাবনে উনার পরোক্ষ অবদান ছিল। কাজী পেয়ারার জাতটি উদ্ভাবন হয় দেশি একটি পেয়ারার জাতের সাথে থাইল্যান্ডের একটি জাতের সংকরায়ণের মাধ্যমে। থাইল্যান্ডের ভাল জাতের একটি পেয়ারা একজন বিদেশি কনসালটেন্ট হাতে করে নিয়ে আসেন। কাজী স্যারকে খাওয়ার জন্য দিলে উনি সে পেয়ারা একটু খাওয়ার পর বুঝলেন এ জাতটি সংকরায়ণ করে ভাল একটি জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব। উনি সে পেয়ারা অবশিষ্ট অংশ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফল বিজ্ঞানীদের হাতে দেন সংকরায়ণের জন্য। সংকরায়ণের ফলে কাজী পেয়ারা উদ্ভাবন হয়। বিজ্ঞানীরা তাঁর নামানুসারে পেয়ারার এ জাতটি 'কাজী পেয়ারা' নামে নামকরণ করেন। এটি দেশে ও দেশের বাইরে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি জাত। ধানের বাইরে বাংলাদেশের প্রধান দুটি দানাদার ফসল গম ও ভুট্টা চাষ শুরুর ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন তিনি। তাঁর গবেষণার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের গম ফসলের চাষ ব্যাপক আকার ধারণ করে। বাংলাদেশে আধুনিক জাতের গম চাষ শুরু এবং ভুট্টার বাণিজ্যিক আবাদ তাঁর অবদানের ফসল। পোলট্রি শিল্পের খাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার শুরুর গবেষণাও তাঁর অনন্য অবদান। তিনি ভুট্টার দানা থেকে ভুট্টার তেল উৎপাদনের জন্য কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের সব সময় তাগাদা দিতেন। উনার নামেই ছত্রাকের গণ 'কাজিবোলেটাস' নামকরণ করা হয়।

ড. বদরুদ্দোজা ৯৭ বছরের জীবনে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করে গেছেন। তিনি পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিলে রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ লাভ করে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিলের পরিচালক হয়েছিলেন। তিনি ১৯৫৭ সালে ইকোনমিক বোটানিস্ট (ফাইবার) পদ লাভ করেন।

তিনি ব্রিটিশ বাংলায় উদ্ভিদ প্রজননকারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শস্য ও ফসল ব্যবস্থার উন্নতিতে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। এরপর তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS) গঠনে ভূমিকা রাখেন।

তিনি তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে কৃষিক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। পাকিস্তান আমলে তিনি তঘমা-ই-পাকিস্তান এবং তঘমা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব লাভ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি লাভ করেছিলেন বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ কল্যাণ ট্রাস্ট সম্মাননা। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে 'ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট' পদে ভূষিত করে। কৃষিতে অবদানের জন্য ১৯৯৯ সালে বিশ্ব কৃষি গবেষণা সংস্থা আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে তাঁকে সম্মাননা প্রদান করেন। তিনি বিশ্বের অনেক দূরদর্শী নেতা ও বিশ্বের খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। এর মধ্যে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. নরম্যান ই. বোরলগ, ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক ড. স্বামীনাথন উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে কৃষির বিনির্মাণে ড. কাজী বদরুদ্দোজার অবদান অপরিসীম। তিনি শুধু কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়েন নি, কৃষি গবেষণার জন্য আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদও তৈরি করেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে কৃষি গবেষণা ও প্রশিক্ষণে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের সবচেয়ে সম্মানিত পুরস্কার স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে স্যার যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, আমি কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে কাউন্সিলকে ঠিক সেভাবেই পরিচালনা করেছিলাম। আর

এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করে।

ড. বদরুদ্দোজা গত ৩০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ৯৭ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত জটিলতায় ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মুত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর দু'দিন আগে আমি ও মাননীয় কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার স্যারকে হাসপাতালে দেখতে যাই। স্যার কৃষি সচিবকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। কৃষি সচিব স্যারের চিকিৎসার ব্যাপারে ক্লিনিকের ডাক্তারদের সাথে আলাপ করে বলেন, স্যারের চিকিৎসার জন্য যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হলে তাঁকে যেন জানানো হয়। হাসপাতালে বসে স্যারের প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের কথা খুব মনে হচ্ছিল। স্যার বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার এর প্রেসিডেন্ট। তখন স্যার এর বয়স ৯৫ বছর। এর মধ্যে স্যার কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক এক প্রকল্প নিয়ে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনে হাজির হলেন। স্যার এর আগ্রহ ও কাজ করার স্পৃহা দেখে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে প্রকল্পটি অনুমোদন করি। অনুমোদনের পর কয়েকটি কর্মশালা করে হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তিসমূহের মডিউল তৈরি করলেন। যতই দেখতাম মুগ্ধ হতাম। আন্তরিকতার কোন ঘাটতি নেই। এরপর আসলেন নতুন এক পরামর্শ নিয়ে। ভুট্টার তেল বানাতে হবে। সিমিটকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার জন্য স্যার অনুপ্রাণিত করলেন। সিমিট একটি কর্মশালার আয়োজন করলো। স্যার কর্মশালার প্রধান অতিথি ছিলেন। স্যারের পাশে আমি বিশেষ অতিথি। স্যারের বক্তব্য জুড়েছিল ভুট্টার তেল বানাতে হবে। তেল আর পশুখাদ্য একসাথে হয় এমন জাত বের করতে হবে। আমরা এখন সে চেষ্টা করছি।

এর এক বছর আগে ফল নিয়ে এক কর্মশালায় স্যারের দুটি ফলের প্রতি দুর্বলতার কথা বার বার বলছিলেন। একটি হলো বারি মাল্টা-১ এর দেশব্যাপী সম্প্রসারণ এবং দ্বিতীয়টি হলো বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী এ্যাভকেডোর জাত উদ্ভাবন। কৃষিবিজ্ঞানীরা স্যারের এ দু'টি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবেন, এ আমার প্রত্যাশা। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের হলে স্যারের আত্মা তৃপ্তি পাবে।

২০২৩ সালের আগস্ট মাসের ৩০ তারিখে উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় স্যার আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁকে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। কাজী স্যারের মৃত্যুতে জাতি হারালো একজন কর্মবীর সাদা মনের মানুষকে। কিন্তু কীর্তিমানের কখনও মৃত্যু হয় না। তাইতো কাজী স্যারের বাংলাদেশের কৃষিতে অবদান চিরস্মরণীয় এবং চির অম্লান থাকবে।

লেখক : সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

আমার দেখা কাজী বদরুদ্দোজা

ড. দেবাশীষ সরকার

ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা বাংলাদেশের কৃষির মহানায়ক। যার দেখানো পথে বাংলাদেশে কৃষির জয়যাত্রা। উনার প্রত্যয় ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে কৃষিকে নিতে হবে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায়। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যার প্রায় ৯০% মানুষের পেশা কৃষি। সমস্যার সংকটে জরাজীর্ণ দেশে কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু ড. কাজী বদরুদ্দোজার উপর আস্থা রেখেছিলেন। তার আস্থার পুরো মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন ড. কাজী বদরুদ্দোজা। সময়ের সাথে কমেছে জমি, বেড়েছে দেশের জনসংখ্যা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের সাত কোটি মানুষ এখন ১৮ কোটি। কিন্তু একজন মানুষও আজ আর খাবারের অভাবে মারা যায় না। কৃষি উন্নয়নে এই বীজ বপন করেন ড. কাজী বদরুদ্দোজা। তার দেখানো পথে খরপোষের কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা পরিকল্পনা আর নির্দেশনায়। দেশের কৃষির এমন কোনো সেক্টর নেই যেখানে উনার অবদান নেই। যে সেক্টরে তাঁর কর্ম সমৃদ্ধ করেনি।

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা বাংলাদেশে কৃষির কিংবদন্তি। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণায় তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য, সরব, গতিময় ও অনুকরণীয়। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষিবিজ্ঞানী এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। তিনিই বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন সমৃদ্ধির বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং-৩২ জারিকরণের মাধ্যমে কৃষি গবেষণার উন্নয়ন ও সমন্বিত কার্যক্রমের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং-৬২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন এই কৃষি ব্যক্তিত্বের আবদান অনস্বীকার্য। দেশের সকল কৃষি বিষয়ক সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের জন্য তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধুর আদেশে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলও স্থাপিত হয়। তাঁর

প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এবং ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরই নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইপসা পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি ইনস্টিটিউট (বিআইএনএ) পুনর্গঠন করেন। শুধু দেশেই না, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (ISNAR), প্রতিষ্ঠা লগ্নে তাঁর অবদান বাইরের জগতে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। ISNAR প্রতিষ্ঠার খাতায় তাঁর নামও লেখা রয়েছে এবং তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম গভর্নিং বডির সদস্যও ছিলেন। এছাড়াও ভিয়েতনামের জেনেটিক্স ইনস্টিটিউট, পাকিস্তানের এরিড জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপনেও তাঁর আবদান অনস্বীকার্য।

বর্ষীয়ান এই কৃষিবিজ্ঞানী তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে মেধা ও পরিশ্রমের দ্বারা বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি ব্রিটিশ বাংলায় উদ্ভিদ প্রজননকারী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শস্য ও ফসল ব্যবস্থার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থা (এনএআরএস) গঠন করে সকল কৃষি সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড সমন্বয়ের উদ্যোগ নেন। বাংলাদেশে কৃষির যে অবকাঠামো দেখা যায় তার বেশির ভাগই ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা সক্রিয় উদ্যোগের ফসল। তিনি উচ্চ ফলনশীল ফসলের বিভিন্ন জাত উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের গম ও ভুট্টা ফসলের চাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

সম্মানের প্রতীক হিসেবে জনপ্রিয় জাত কাজী পেয়ারা ড. কাজী বদরুদ্দোজার নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নাল ও ম্যাগাজিনে তাঁর অনেক গবেষণা নিবন্ধ/পপুলার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি বই এবং মাসিক ম্যাগাজিনে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

ড. কাজী বদরুদ্দোজা তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে কৃষিক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে বহু পুরস্কার ও খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। পাকিস্তান আমলে তিনি তঘমা-ই পাকিস্তান এবং তঘমা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব লাভ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি লাভ করেছিলেন বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ কল্যাণ ট্রাস্ট সম্মাননা। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট পদে ভূষিত করেন। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট ১৯৯১ সালে কৃষিতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি জানাতে তাঁকে স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯৯৯ সালে কনসালটেটিভ গ্রুপ অব ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চ ও বিশ্বব্যাংক ওয়াশিংটন ডিসিতে তাঁকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে। ভারতের বিশ্ব উন্নয়ন সংসদ তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। এছাড়াও বাংলাদেশ হর্টিকালচার সোসাইটি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস রিসার্চ কাউন্সিল, প্ল্যান্ট ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিক্স সোসাইটি বাংলাদেশ, আবু হোসেন সরকার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার, রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সময় তাকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। তিনি ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে বিএআরসির চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে কৃষি গবেষণায় দক্ষ জনবল তৈরি করেন। যার ফলশ্রুতিতে দেশে খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে সমান তালে বেড়েছে। কৃষিতে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজাকে দেশের সবচেয়ে সম্মানিত পুরস্কার 'স্বাধীনতা পদক' প্রদান করেছে।

ড. এম কাজী বদরুদ্দোজার শিক্ষাজীবন ছিল অতি গৌরবের। তিনি ১৯৪২ সালে মাধ্যমিক এবং ১৯৪৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রি অর্জনের পর ভর্তি হন উপমহাদেশের প্রথম কৃষি কলেজ তেজগাঁওস্থ বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটে, বর্তমানে যেটি শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সুপরিচিত। সেখান থেকে ১৯৪৮ সালে বিএজি এবং ১৯৫২ সালে এমএজি পাশের পর কর্মজীবন শুরু করেন এগ্রিকালচার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। এরপর ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখান থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পর দেশে ফিরে কৃষি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিশ্বের অনেক দূরদর্শী ও খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের

সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। এদের মধ্যে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. নরম্যান ই বোরলগ, ভারতের গ্রিন রেভুলেশন এবং কৃষির পথিকৃৎ ড. স্বামীনাথন উল্লেখযোগ্য।

শেষের দিনগুলিতে দেখা কাজী স্যার

১. কেমন মানুষ ছিলেন তিনি? নিঃসন্দেহে একজন দেশপ্রেমিক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন মানুষ। ২০২১ সালের অক্টোবরে কর্মরত ছিলাম ডাল গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনাতে ওই কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে। অনেকটা অবিশ্বাস্যভাবে দায়িত্ব পেলাম বারি'র মহাপরিচালকের। চলে আসলাম গাজীপুরস্থ হেডকোয়ার্টারে। মনে হল এরকম একটি বড় প্রতিষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব পালনের তো চ্যালেঞ্জ অনেক। কিছু না ভেবেই স্ত্রী ও দুই পুত্র সন্তানকে সাথে নিয়ে চলে গেলাম কাজী স্যারের উত্তরাস্থ বাসভবনে। আগে থেকেই যোগাযোগ করেছিলাম যে মানুষটি স্যারকে সবসময় সেবা দেন, দেখাশোনা করেন সেই পটু বড়ুয়ার সাথে। প্ল্যানমাফিক চলে গেলাম স্যারের কাছে। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে দোয়া এবং পরামর্শ চাইলাম। স্যার তো একসময় বারি'র প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার ছিলেন। প্রায় ৯৭ বছর বয়সী একজন মানুষ তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে কি করতে হবে তার একটি চমৎকার রূপরেখা দিলেন। সেটিই ছিল আমার জন্য প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেয়ার একটি চমৎকার দিক নির্দেশনা।

২. নিশ্চয়ই মনে আছে ২০২১ সালে সারা পৃথিবী যুদ্ধ করছে করোনাভাইরাস-এর বিরুদ্ধে। যারা আমরা কাজী স্যারের স্নেহভাজন, শুভাকাঙ্ক্ষী সকলেই শঙ্কিত এ মানুষটিকে নিয়ে। এরকম পরিস্থিতিতে একদিন কাজী স্যার সরাসরি আমাকে ফোন করে বললেন, কেন তুমি আমাকে বারি ক্যাম্পাসে নিয়ে যাচ্ছো না? আমি উত্তরে দুটো কথা বলেছিলাম : উত্তরা ও গাজীপুরের রাস্তার বেহাল অবস্থা এবং করোনাভাইরাস দ্বারা আক্রান্তের ঝুঁকি। অনেক বুঝিয়ে উনাকে শান্ত করেছিলাম সেদিন। মানুষটি বারি পরিবারকে কতটা ভালোবাসেন এটিই তার প্রমাণ।

৩. মৃত্যুর মাস তিনেক আগে আমাকে ফোন করে হঠাৎই গাইবান্ধা যাবার বায়না ধরলেন। তখন তো অনেকটা করোনা ভাইরাসমুক্ত বাংলাদেশ। কি আর করা, একটা গাড়িতে উনার সাথে দু-তিনজন আত্মীয়-স্বজনসহ গাইবান্ধা যাবার ব্যবস্থা করলাম। ফিরে আসা পর্যন্ত দারুণ উৎকণ্ঠায় ছিলাম। মৃত্যুর পরে শুনেছি সেসময় উনি শেষ থাকার জায়গাটি ঠিক করতে গিয়েছিলেন, যেখানে এখন তিনি ঘুমিয়ে আছেন।

৪. কাজী স্যারের মৃত্যু হয়নি, বেঁচে আছেন তিনি তার লালিত সহস্র স্বপ্নের মাঝে। যে স্বপ্নগুলো লালন করব আমরা, বাস্তবায়নে ব্রতী হবো সবসময়। যেগুলো পারবো না, দায়িত্ব দিয়ে যাব নতুন প্রজন্মের কাছে। এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্মে বেঁচে থাকবেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কাজী স্যার, ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা।

লেখক : সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

ইমেরিটাস কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা

ড. আবদুল হালিম

১৯৬২ সালে আমরা ঢাকার তেজগাঁওয়ে শেরে বাংলা কৃষি ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার পর কয়েকজন বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানীর কথা বিভিন্ন সময় কলেজের স্যারদের মুখে শুনতাম। তাঁদের মধ্যে ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা, ড. হাসানুজ্জামান ও ড. আলিমুল্লাহ শিকদার সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময় তাঁরা কৃষি ইনস্টিটিউটে আসতেন এবং মাঝে মাঝে ক্লাসও নিতেন। কাজেই আমার ছাত্র জীবন থেকেই আমি ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্যারকে চিনতাম কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করার সুযোগ হয়নি। আমি ১৯৬৮ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষা বিষয়ে মাস্টারস ডিগ্রি অর্জন করার পর একই বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করি। তখন বিভিন্ন কাজে আমাকে ঢাকায় আসতে হতো। সহপাঠীসহ অনেকে যারা ঢাকায় চাকুরি করতেন তাদের সাথে দেখা হতো। কাজী স্যার তখন চাকুরি করতেন পাকিস্তান কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে, করাচীতে।

স্যারের সাথে আমার কর্মজীবনের সর্ব প্রথম ব্যক্তিগত পরিচয় ১৯৭৬ সালে। আমি সবেমাত্র ফিলিপাইন থেকে কৃষি সম্প্রসারণে পিএইচডি করে দেশে আসি এবং যথারীতি বাকৃবির কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগে কাজে যোগদান করি। ঢাকায় আসলেই কৃষি পেশায় নিয়োজিত বন্ধুদের সাথে দেখা স্বাক্ষাৎ হতো। একদিন বিএআরসি'তে কাজী স্যারের সাথে অফিসের নিচে দেখা। স্যার গাড়িতে উঠবেন। স্যারকে সালাম দিয়ে আমার পরিচয় দিলাম। স্যারকে কিছু কথা বলার অনুমতি চাওয়ার পর আমাকে স্যারের সাথে গাড়িতে উঠতে বললেন। স্যার তখন বিএআরসি'র ধানমন্ডির অফিসের দিকে যাচ্ছিলেন। গাড়িতে বসে আমার কথা শুনে বললেন তোমার পিএইচডি এর গবেষণার বিষয়টি আমাদের দেশের জন্য খুবই উপযোগী। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার মত শিক্ষক খুব প্রয়োজন। তোমাকে কৃষি সম্প্রসারণ বিষয়ক গবেষণাও করতে হবে । কৃষি সম্প্রসারণের বিষয়ে বাংলাদেশে প্রচুর কাজ করার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সে কাজ করার সুযোগ বেশি হবে। খুব উৎসাহ পেলাম স্যারের এমন পরামর্শে।

পেশাগত কাজের অভিজ্ঞতা

১৯৮২ সালের কথা। মরহুম প্রফেসর মোসলেহউদ্দীন স্যার তখন বিএআরসি এর সদস্য পরিচালক। কাজী স্যার চেয়ারম্যান। তাঁরা দুজনেই কৃষি ইনস্টিটিউটে সহপাঠী ছিলেন। কাজী স্যারের নেতৃত্বে তখন বিএআরসি South East Asia Regional Cooperation for Agriculture Development (SEARCA) শিরোনামের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছিলেন। প্রকল্পটির Appropriate Structural Arrangement for Effective Transfer of Technology in South East Asia অংশের জন্য কাজী স্যার আমাকে অন্তর্ভূক্ত করলেন। প্রকল্পের অন্যান্য সদস্য ছিলেন মোসলেহউদ্দীন স্যার এবং বিএআরসি'র তৎকালীন পুষ্টি বিজ্ঞানী ড. আব্দুর রহিম।

আমি বাংলাদেশের কৃষি সম্প্রসারণ বিষয়ক তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এবং বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিই। কিছুদিন পর কাজী স্যার আমাকে ডাকলেন এবং বললেন তোমার রিপোর্টটা খুবই ভালো হয়েছে। অন্যান্য সদস্যগণও আমার রিপোর্টের প্রশংসা করলেন। কাজী স্যারের পরামর্শে আমি উক্ত রিপোর্টটি পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশ করলাম। কাজী স্যার আমার উপর এত খুশি হয়েছিলেন যে, স্যার আমাকে কানাডাতে সম্প্রসারণ বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করার জন্য মনোনয়ন দিয়ে কাউন্সিলের অর্থায়নে কানাডাতে পাঠিয়েছিলেন।

কাজী স্যারের সাথে অন্য একটি টিমে কাজ করারও সুযোগ আসে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে। স্যার তখন বিএআরসি থেকে অবসর নিয়েছেন। ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট হিসাবে বসতেন বিএআরসি'তে একটি কক্ষে। তখন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। সে কমিটিতে কাজী স্যার আমাকে অন্তর্ভুক্ত করলেন। কাজী স্যার ছিলেন টিম লিডার। বাকি তিন জন সদস্যের একজন ছিলেন ভারতীয় এক কৃষিবিজ্ঞানী, ড. হাসানুজ্জামান ও ড. সুফি মহিউদ্দিন সাহেব। আমার দায়িত্ব ছিল প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন। নির্দিষ্ট সময়ে আমি আমার রিপোর্ট লেখা শেষ করে

কাজী স্যারকে হস্তান্তর করি। কিছুদিন পর স্যার আমাকে ডেকে বললেন, "তোমার রিপোর্টটি খুব ভাল হয়েছে" এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীও তোমার রিপোর্ট এর প্রশংসা করেছেন। স্যারের মুখে প্রশংসা শুনে সেদিন আমার খুবই ভালো লেগেছিল।

গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (জিটিআই) বিদেশি কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকতা করার সময় ১৯৭৭ সাল থেকে আমাকে জিটিআই এর পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে আমাকে বিএআরসি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ অনেক প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করতে হতো। ১৯৮৩ সালের কথা। কাজী স্যার একদিন সকালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. শামসুল হুদাসহ জিটিআই এসে হাজির হলেন। ড. সামসুল হুদা পরবর্তীতে সরকারের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর দায়িত্ব পালন করেন। স্যার এসে আমাকে বললেন আমরা বিটিভি'তে জিটিআই কর্তৃক ২৫ জন শ্রীলংকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রতিবেদন দেখে তোমাদের খোঁজখবর নিতে আসলাম। স্যারকে বললাম, বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সাহায্যতায় আমরা আগামী আরও তিন বছর ট্রেনিং এন্ড ভিজিট পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছি। বিটিভির তৎকালীন পরিচালক জনাব ফারুক আলমগীর সাহেব যিনি কবি ফারুক আলমগীর হিসেবেও পরিচিত, উনাকে এ বিষয়ে ঢাকার বিটিভি অফিসে এসে উক্ত প্রোগ্রাম ধারণ করার জন্য দাওয়াত দিতে এসেছিলাম। তিনি সমস্ত শুনে উৎসাহিত হয়ে নিজেই উক্ত প্রশিক্ষণের প্রথম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যেতে সম্মত হলেন।

উনি নিজেই বাকৃবিতে এসে সরাসরি প্রশিক্ষণের ভিডিও ধারণ করার উদ্যোগ নেন। উক্ত প্রশিক্ষণে ফারুক আলমগীর সাহেব শ্রীলংকার প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে একটি ক্লাসও নিয়েছিলেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'গণসংযোগ বা কমিউনিকেশন'। ক্লাসটি শ্রীলংকার প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ বেশ উপভোগ করেছিলেন। কাজী স্যার ও ড. শামসূল হুদা শ্রীলংকার সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সাথেও প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সন্তোষ প্রকাশ

করেন। আলোচনা শেষে তাঁরা ভবিষ্যতে জিটিআইকে কীভাবে আরও সমৃদ্ধ করা যায় সে বিষয়ে আমাদের কিছু পরামর্শ দেন। স্যার এরপর থেকে প্রায়ই বিআরসিএ এর তৎকালীন ট্রেনিং পরিচালক আহমেদ হোসেন সাহেব এবং প্রশিক্ষণ ইউনিটের অন্যান্য কর্মকর্তাদের জিটিআইতে পাঠাতেন আমাদের কার্যক্রম বিষয়ে খোঁজখবর নিতে।

ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) এর সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজন

আমি ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯৭ সাল পর্যন্ত ডেপুটেশনে ইপসার রেক্টর এর দায়িত্ব পালন করি। তখন ইপসা এর একাডেমিক ও অন্যান্য গবেষণার অর্থায়ন হতো জাপান সরকারের অর্থায়নে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯৫ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে যাবে। কাজী স্যারের হাত দিয়েই ইপসা সৃষ্টি এবং তিনি ইপসার প্রতিষ্ঠাতা সিন্ডিকেট সদস্য। কাজী স্যারের সাথে ইপসার প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্যার বললেন, ইপসার প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান অবশ্যই প্রকল্প মেয়াদে হতে হবে। হাতে সময় খুবই কম। এর মধ্যে সব আয়োজন করতে হবে। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তা হলো, মাননীয় আচার্য মহোদয় থেকে সমাবর্তনের জন্য তারিখ নেয়া। উনার সময়ের ওপর নির্ভর করবে কত তারিখে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হবে। বলা বাহুল্য, ইপসা ছিল কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা। ইপসার আচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সে সময়ে বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ইপসা এর আচার্য। কাজী স্যারের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করে আমরা তারিখ পেয়ে গেলাম ২২শে জুন, ১৯৯৫। সবাই মিলে কাজী স্যারের সহায়তায় আমরা খুবই সুন্দরভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে সমর্থ হলাম। কাজী স্যার ছিলেন ইপসার প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সমাবর্তন বক্তা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইপসা থেকে পাশ করা এমএস ও পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্তদের সনদ বিতরণ করলেন। অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হওয়াতে কাজী স্যার আমাকে কাউন্সিলে ডেকে ধন্যবাদ জানালেন। আমিও স্যারকে অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে আয়োজনে দিক নির্দেশন ও সহায়তা করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালাম।

ইপসার এর সীমানা প্রাচীর

সমাবর্তন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হওয়ার পর আমি আরেকটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে স্যারের সাথে দেখা করি। বিষয়টি ছিল ইপসা এর সীমানা প্রাচীর। ইপসার চারপাশে সীমানা প্রাচীর না থাকায় আশেপাশের গ্রামের কিছু বাসিন্দা ইপসা এর সীমানার ভিতরে বাড়িঘর তৈরি করা শুরু করে দিয়েছিল। বিষয়টি কাজী স্যারেকে জানানোর সাথে সাথে স্যার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আক্তার আলী সাহেবকে ফোন করে বিষয়টি অবহিত করলেন এবং আমাকে একটি চিঠি কৃষি সচিবকে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। কৃষি সচিব ইপসার বোর্ড সদস্য। কাজী স্যার এবং কৃষি সচিবের উদ্যোগে সে অর্থ বছরেই সীমানা প্রাচীরের প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ পাওয়ার পর সীমানা প্রাচীর দেয়া হয়। কিছু জমি নিয়ে বন অধিদপ্তরের সাথে বিরোধ ছিল। আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে সে সব বিরোধ নিষ্পত্তি করা হল। মূলত: কাজী স্যারের উদ্যোগেই এসব কাজ খুব সহজে হয়ে গিয়েছিল।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ

আমার বাসা উত্তরাতেই। স্যারের বাসা থেকে খুব দূরে নয়। তাই প্রায়ই স্যারের বাসায় যেতাম। কৃষি পেশাজীবীদের সাথে আলাপ করতে স্যার খুব পছন্দ করতেন। স্যারের পরিবার থাকে আমেরিকাতে। স্যার এখানে একটি ছোট বাসাতে একাই থাকেন। আমরা গেলে স্যার খুব খুশি হতেন। মাঝে মাঝে আমি আমার নাতি আয়ানকেও সাথে নিয়ে যেতাম। আয়ানকে স্যার খুব পছন্দ করতেন, আয়ানও স্যারের বাসায় আসতে ভালোবাসতো। কৃষির বাইরেও অনেক সময় স্যার গল্প করতেন। একবার স্যার এক স্বপ্নের কথা বললেন। স্বপ্নটি হল স্যার স্বপ্নে দেখেন তিনি পায়ে হেঁটে একটি ১০০ তলা বিল্ডিংয়ের উপরে উঠলেন এবং পরে আবার পায়ে হেঁটে নামলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাতে উনি স্বপ্নের মধ্যে বা ঘুম ভাঙার পর ক্লান্ত বোধ করেছিলেন কি না? স্যার বললেন, না, ক্লান্ত বোধ করেন নি। আমি স্যারকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে স্যার বললেন, হয়ত আমি ১০০ বছর বাঁচবো। স্যার অবশ্য ৯৭ বছর বয়সে মারা গেলেন। তিনি যাঁদের বেশি ভালোবাসতেন, তাদের ওপর রাগ বা অভিমানও করতেন। আমি যখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর পাপুয়া নিউগিনির একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করি, তখন প্রতি বছরই

ছুটিতে আসলে বা যাওয়ার সময় স্যারের সাথে দেখা করে যেতাম। একবার ব্যতিক্রম হয়েছিল। যাওয়ার আগে ভীষণ ব্যস্ততায় স্যারের সাথে দেখা করে যেতে পারি নি। কয়েক মাস পর দেশে এসে স্যারের সাথে দেখা করতে গেলে স্যার অভিমানের সুরে বললেন, তুমি গতবার যাওয়ার সময় আমার সাথে দেখা করে যাওনি। আমি অবাক হয়ে স্যারের দিকে তাকিয়ে রইলাম, স্যার এটা মনে রেখেছেন। বুঝলাম স্যারের সাথে দেখা করে না যাওয়াতে স্যার কষ্ট পেয়েছেন। আসলে তিনি যখন যাকে ভালোবাসেন তাঁর পরিবারের সাথে মিশে যেতেন। প্রতি নিয়ত স্যার পরিবারের সকল সদস্যের খোঁজ রাখতেন। আমরা স্যারের এমন ভালোবাসার সঠিক মূল্যায়ন হয়ত অনেক সময়ে করতে পারিনি। তবে স্যার আমাকে কি পরিমাণ আপন মনে করতেন, তার একটি উদাহরণ দিতেই হয়। স্যার বেশ কয়েকবার বলেছিলেন, সম্ভব হলে আমার শেষ যাত্রায় অন্যান্যদের সাথে গাড়িতে তুমিও থেকো। আমাকে আমার মা-বাবার পাশে কবর দিও। যদি আমার সাথে যেতে না পারো, তাহলে পরে হলেও একবার আমাকে গিয়ে দেখে এসো। স্যারের আবেগ আমার বুক ভার করে দিত। দেশে হয়ত একা থাকেন বলেই যাঁরা স্যারের আশেপাশে থাকতেন, তাঁদেরকেই স্যার আপন মনে করতেন। আপন মনে করে ভালোবাসতেন, কিছু বিচ্যুতি হলে অভিমান করতেন। সব ভুলে গিয়ে আবার গল্পে মেতে উঠতেন। স্যারের স্বপ্নের কথা বলতেন। উনার গল্পজুড়ে থাকতো কৃষি - ফসল ও ফল। জাত উন্নয়ন, ফলন বৃদ্ধি, কৃষকের উন্নয়ন, পুষ্টির চাহিদা, নিরাপদ খাদ্য, সকলের সুস্বাস্থ্য। কোনোদিন পরচর্চা করেন নি। গল্পে গল্পে মনে হতো ক্লাস করতে বসছি। স্যারের সফলতার সব কাহিনি শুনতাম। উন্নয়ন সহযোগীদের স্যারের প্রতি আস্থা আর মন্ত্রণালয়ের সচিবগণের সহযোগিতা - স্যারের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

মানসিক দৃঢ়তা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব আবদুল মান্নান সাহেব আমার বাসার পাশেই থাকতেন। প্রায়ই আমরা এক সাথে বিকেলে স্যারের বাসায় যেতাম। মান্নান সাহেব একদিন আমাকে বললেন স্যার নাকি তাঁর নিকট বেশ কিছু টাকা দিয়ে অনুরোধ করেছেন, স্যারের মৃত্যুর পর যেন সে টাকা দিয়ে তাঁর মৃতদেহের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাঁকে গাইবান্ধায় তাঁর বাবা-মায়ের কবরের পাশে কবর দেয়া হয়।

দুর্ভাগ্যবশত স্যারের মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগেই জনাব মান্নান সাহেব মারা যান। এর কিছুদিন পর স্যার নিকটবর্তী একটি মাদ্রাসায় মৃত ব্যক্তির গোসল দেয়ার জন্য একটি কক্ষ তৈরির জন্য টাকা দান করেন এবং সে মাদ্রাসায় অছিয়ত করেন যেন স্যারের মৃত্যুর পর সেখানেই গোসল দেয়া হয় ও জানাজা পড়ানো হয়। স্যার এর মৃত্যুর পর সেখানেই গোসল দেয়া হয় এবং জানাজা হয়। স্যার মৃত্যুর পূর্বে নিজের দাফন ও জানাজা কোথায় হবে এবং কোথায় কবর হবে, তার সব ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। তিনি মৃত্যুর জন্য সব সময়ই প্রস্তুত ছিলেন। তবে পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কেবল কৃষি ও কৃষকের কথাই চিন্তা করে গেছেন।

একবার স্যারের কিছু টাকা চুরি হয়েছিল। আলামত দেখে মনে হয়েছিল বাইরের কোন লোক দোতলায় উঠে জানালা কেটে ঢুকে টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে। চুরির ঘটনাটি পুলিশকে জানালে পুলিশ এসে তদন্ত করে চোর শনাক্ত করতে সক্ষম হল। মূলত: বাসার একজন সহযোগী লোভে পড়ে কাজটি করে ফেলেছে। স্যার এই সহযোগীকে কোন শাস্তি না দিয়ে তাকে আরও ৩০,০০০ টাকা দিয়ে বিদায় করে দেন। বললেন, গ্রামে গিয়ে কিছু একটা ব্যবসা করে জীবন যাপনের চেষ্টা করো।

বিদায় ক্ষণে

স্যার আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে শ্বাসকষ্ট নিয়ে প্রথমে শিপ হাসপাতালে এবং পরে উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ভর্তি হন। আমি প্রায়ই স্যারকে দেখতে যেতাম। আমার কেবল মনে হতো, এ যাত্রায়ও স্যার সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু শিপ হাসপাতাল থেকে উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে আসার পরদিন দিন যখন স্যারের শরীর খারাপ হতে লাগলো, কিছুটা হতাশ হতে লাগলাম। এর মধ্যে একদিন স্যারের মেয়ে আসলো আমেরিকা থেকে স্যারকে দেখাশুনার জন্যে। মনে আবার একটু সাহস পেলাম কারণ মেয়ে আমেরিকার অনেক বড় একটি হাসপাতালের ডাক্তার এবং অধ্যাপক। স্যারের মেয়ের সাথে কথা বলে বুঝলাম মেয়ে নিজেও খুব আশা করতে পারছে না যে স্যার সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে যাবেন। প্রতিদিনই স্যারকে দেখতে উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। মৃত্যুর একদিন আগে স্যারকে যখন আইসিইউ থেকে লাইফ সাপোর্টে নেয়া হল সেদিন আমি আর স্যারের

চেহারার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। সেদিন তাঁর আরেক ডাক্তার ছেলেও আমেরিকা থেকে এসেছিল। তার সাথে কথা বলে বুঝলাম স্যারের সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এক বুক কষ্ট নিয়ে বাসায় ফিরে গেলাম। ফরিদ সাহেবের হোয়াটসঅ্যাপ পোস্ট খেয়াল করতাম সব সময়ই। ফরিদ সাহেব বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার এর ফেলোদের জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলেছিলেন। সেখানে তিনি সার্বক্ষণিকভাবে স্যারের স্বাস্থ্যের আপডেট দিতেন। পরদিন সকাল বিকেল দু'বেলাতেই হাসপাতালে গেলাম। বিকেলে স্যারের অন্তিম সময়। আমরা স্যারের কেবিনে বসে আছি। এমন সময় স্যারের মেয়ে ডাক্তার তাসনিম এসে বলল, আপনারা যারা আমার বাবাকে শেষ এক নজর দেখতে চান, এখন দেখে আসেন। ফরিদ সাহেব আর আমি দৌড়ে গেলাম আইসিইউতে যেখানে স্যারকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। ফরিদ সাহেব আমাকেই আগে যেতে অনুরোধ করলেন। আমি এ্যাপ্রোন পড়ে ঢুকে স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। স্যারের পাশে স্যারের ছেলে ডাক্তার সনি বসে আছে। আমার যেন মনে হলো স্যার বেঁচে নেই। বেরিয়ে ফরিদ সাহেবকে এ্যাপ্রোন দিয়ে অপেক্ষা করছি। ফরিদ সাহেবও ভীষণ বিষণ্ণ মুখে ফিরে এলেন। বললেন, সময়ের ব্যাপার মাত্র। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ফরিদ সাহেব মেসেজ লিখবেন, এমন সময় মেয়ে ডাক্তার তাসনিম আবার স্যারের বেডের পাশ থেকে এসে জানালেন স্যার নেই। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে স্যার এ দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। ফরিদ সাহেব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নিউজ দিলেন এবং ফেসবুকেও স্যারের মৃত্যু সংবাদ সকলকে জানিয়ে দিলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসপাতাল লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে স্যারকে স্যারের অছিয়ত করা মাদ্রাসায় গোসল দিয়ে জানাজা হলো। পরদিন সকালে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে দ্বিতীয় জানাজা পড়ে স্যারকে গাইবান্ধা বাবা মায়ের পাশে কবর দেয়া হলো। হে আল্লাহ, আপনি ড. কাজী বদরুদ্দোজা এর সকল জানা অজানা গুনাহ মাফ করে তাঁকে জান্নাত দান করুন।

লেখক : ফাউন্ডার ফেলো, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার (বাগ)
প্রাক্তন প্রফেসর ও প্রধান, কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)

ইমেরিটাস কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার সাথে আমার পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনের অসামান্য স্মৃতিসমূহের বিবরণ

কৃষিবিদ ড. আনোয়ারুল কাদের শেখ

বরেণ্য কৃষিবিজ্ঞানী, বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের পথিকৃৎ, প্রখ্যাত কৃষি সংগঠক, জনাব ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার সাথে আমার পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিসমূহের বিবরণ লিখতে গিয়ে আমার প্রাণ ও চক্ষু ঠিকমতো কাজ করছে না। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কাজী স্যারের অবদান এবং সমগ্র কর্মজীবনে তাঁর অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ দূরদর্শিতা, কর্মদক্ষতা এবং অসীম আত্মপ্রত্যয় আজও আমাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে।

আমি ১৯৬৪ সালে আণবিক শক্তি কেন্দ্র, ঢাকায় চাকুরি গ্রহণের দুবছর পর পিএইচডি ডিগ্রি করতে লন্ডনে যাবার সময় স্যারের সঙ্গে দেখা করে দেশের গরীব মানুষের খাদ্যে প্রোটিন উন্নয়নের স্বার্থে ডাল শস্যের উন্নতজাত উদ্ভাবনে আশা ব্যক্ত করি। তিনি ছোলা, মসুর, মাস কলাই, মুগ ও খেসারীর সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত জাতের বীজ সংগ্রহ করে দেন। আমি লন্ডনে ঐ জাত গুলির উপর মিউটেশন গবেষণা করে নতুন জাত উদ্ভাবন করি। উচ্চ ফলন ও উচ্চ প্রোটিন যুক্ত ছোলার জাত "হাইপ্রোছোলা"তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

আমার অক্লান্ত পরিশ্রমে ময়মনসিংহে 'বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট' স্থাপনে কাজী স্যারের অবদান অসামান্য। তাছাড়া ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য ২১ লক্ষ টন চাউল ও গম আমদানি হয়েছিল।স্বাধীনতার পর তাঁর দেখানো অবিচল লক্ষ্যেও পথে ছুটে চলেছি আমরা কৃষিবিদগণ। তাঁর প্রচেষ্টোয় শস্য গবেষণা, সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধিতে অসামান্য অবদানে আমারও যুক্ত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমটিরি অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন ড. আনোয়ারুল কাদের শেখ, ড. জহুরুল করিম, খন্দকার আজহারুল ইসলাম। কমিটি দুই মাস কাজ করে

প্রোগ্রাম তৈরি করে। প্রোগ্রামে ধানের নতুন উন্নত জাতসমূহের বীজ বর্ধন, কৃষক প্রশিক্ষণ, বি.এ.ডি.সি. কর্তৃক সারা দেশে ডিপ টিউবওয়েল এবং বিশেষ করে শ্যালো টিউবওয়েল স্থাপন ইত্যাদি কারণে ২০০১ সালের শেষ নাগাদ দেশ খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ং- সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই সব কারণে কাজী স্যার আমাদের স্মৃতির পাতায় সতত ভাস্বর। আমরা কিছুতেই তাঁকে ভুলতে পারি না। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে তাঁর অসামান্য নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা এবং কৃষি গবেষণার জন্য বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ জাতির জন্য সৌভাগ্য অর্জন করে চলেছে আজ অবধি।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি স্যারের অবসর জীবনে নানাভাবে জড়িত ছিলাম। বি.এ.আর.সিতে তাঁর ২০৬ নং কক্ষের অফিসে স্যারের অর্জিত মেডেল, প্রশংসাপ্রত্র, আজীবন সম্মাননা, ইত্যাদি একটি কাঠের আলমারিতে রাখা হত। আমি ১৯৯৮ সালে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে অবসর গ্রহণের পর, ছয় ফুট উঁচু ও দুই ফুট চওড়া একটি শো-কেস স্যারকে উপহার দিয়েছিলাম। সেটি আজও ইমেরিটাস সাইন্টিস্ট হিসেবে বি.এ.আর.সিতে ২০৬ নং রুমে রক্ষিত আছে এবং স্যারের প্রাপ্ত উপহার গুলি ধারণ করছে। স্যারের জীবনের শেষ ৭-৮ বছর স্যারকে আমি শীতের এবং গরমের পোষাক, নানা প্রকার ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ও জিংক ট্যাবলেট দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। মৃত্যুর প্রায় ৪ বছর আগে আমি আমার হজের এহরামরে কাপড় স্যারকে কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহারের জন্য (জমজমের পানিতে ধোয়া) উপহার দিয়েছিলাম। অশ্রুসিক্ত চোখে স্যার কাপড়টি বুকে জড়িয়ে রেখেছিলেন অনেকক্ষণ। আমি নিজেও আবেগাপ্লুত হয়েছিলাম।

সর্বশেষ, আমার স্মৃতির পাতায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে ৫ই এপ্রিল ২০২২ সালে স্যারের আমাকে দেয়া একটি মানপত্র যেখানে স্যার আমাকে "বাংলাদেশে শস্যের মিউটেশন প্রজনন পদ্ধতির স্থপতি" আখ্যা দিয়েছেন। মানপত্রটি এখানে জুড়ে দিলাম। আল্লাহ তায়ালা স্যারকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

লেখক : প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মানপত্র

কৃষিবিদ ড. এম. আনোয়ারুল কাদের শেখ, বি.এস.(এজি) ও এম.এস.(এজি), এ.ইউ.বি., বৈরুত এবং পিএইচ.ডি (লন্ডন), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (ময়মনসিংহ)- এর প্রাক্তন মহাপরিচালক।

(১) তিনি ১৯৬৪ সালে "আণবিক শক্তি কেন্দ্র" ঢাকায় "এগ্রিকালচার ডিভিশন"এ যোগদান করেন।

(২) তাঁর চেষ্টায় ১৯৭২ সালে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে "অ্যাটমিক এনার্জি এগ্রিকালচার সেন্টার" স্থাপনের কাজ শুরু হয়।

(৩) ১৯৭৫ইং সালে তাঁর চেষ্টায় ঐ সেন্টার এর নাম বদল করে "ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার"("আইএনএ") রাখা হয় এবং ঢাকা হতে আণবিক শক্তি কেন্দ্রের সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সেখানে বদলি করা হয়।

(৪) "আইএনএ" সংস্থাটিকে বিজ্ঞান মন্ত্রণালয় হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরের জন্য আন্দোলন শুরুর স্বার্থে ড. শেখ "আইএনএ"-তে "বৈজ্ঞানিক সমিতি" গঠন করেন এবং গোপনে আমার সাহায্য কামনা করেন। এক পর্যায়ে ড. শেখ (সভাপতি) এবং ড. পাটোয়ারী (সাধারণ সম্পাদক) এই কারণে চাকুরিচ্যুত হচ্ছিলেন- আমি তা রোধ করি।

(৫) শেষ পর্যন্ত ১৯৮২ সালে "আইএনএ"বিজ্ঞান মন্ত্রণালয় হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত ও ড. শেখ এর চেষ্টায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় এবং নাম হয় "বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার"।

(৬) ড. শেখ ১৯৮৫ সালে "চিফ এডিটর" হিসাবে "বাংলাদেশ জার্নাল অফ নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার" নামক আন্তর্জাতিক মানের বিখ্যাত জার্নাল প্রকাশ করেন এবং ১৯৯৮ সালে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত ১৪ বছর এই জার্নালের "চিফ এডিটর" ছিলেন।

(৭) ড. শেখ অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনাস্থ আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আই.এ.ই.এ.) কর্তৃক এশিয়ার, আফ্রিকার ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের কৃষি বিজ্ঞানীগণের জন্য পরিচালিত তিন মাস মেয়াদি 'মিউটেশন প্রজনন ট্রেনিং কোর্স' সমূহে ১৯৮৪-১৯৯৩ পর্যন্ত ১০টি কোর্সের (শেষের ১৫ দিন করে) প্রায় ৩৫০ জন বিজ্ঞানীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। যার ফলে পৃথিবীর ঐ সমস্ত দেশে শস্যের অভাবিত ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখনও পাচ্ছে।

(৮) ড. শেখ আই.এ.ই.এ. - এর "টেকনিক্যাল কো-অপারেশন এক্সপার্ট" হিসেবে ১৯৮৯ সালে শ্রীলংকায় ৩৫ জন এবং ১৯৮৯-৯০ ও ১৯৯৫ সালে মিয়ানমারে ৪০ জন কৃষিবিজ্ঞানীকে "মিউটেশান প্রজনন পদ্ধতি" বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং দেশ দুইটির গুরুত্বপূর্ণ শস্য সমূহের প্রত্যেকটির জন্য আলাদাভাবে এই প্রজনন পদ্ধতির নয় বছর মেয়াদি গবেষণা প্রোগ্রাম তৈরি করেছেন, (উদ্ভাবিত নতুন জাত চাষের জন্য সরকারি অনুমোদন পাওয়া পর্যন্ত)। ফলে ঐ দুই দেশে শস্য উৎপাদন অনেক বেড়েছে।

তাঁর ৩৩ বছরের চাকুরি জীবনে তিনি ৮টি শস্য (ধান, পাট, ছোলা, মুগ, মাস, খেসারী, মশুর ও ইক্ষু) এবং ১টি সবজির (টমেটো) উপর "মিউটেশন প্রজনন" পদ্ধতিতে উন্নত জাত উদ্ভাবনের গবেষণায় যুক্ত থাকেন। গবেষণায় তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি ছয় বার পদোন্নতি পান যথাঃ এএসও - এসও - এসএসও - পিএসও - সিএসও - ডাইরেক্টর (গবেষণা) - ডাইরেক্টর জেনারেল। তিনি বিভিন্ন উন্নত গুণাগুণ সম্বলিত নিম্নলিখিত ৭টি শস্যের ও ১টি সবজির ১৮টি নূতন জাত উদ্ভাবন করেন এবং দেশে চাষের জন্য অনুমোদিত জাত হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে (নির্দেশিকাঃ বিনা উদ্ভাবিত উন্নত কৃষি প্রযুক্তি পরিচিতি সেপ্টেম্বর - ২০১২ খ্রিঃ)।

ছোলা

(১) হাইপ্রোছোলাঃ মাতৃজাত হতে ৪% উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং ১২% উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাত

(২) বিনাছোলা -২: উফশী জাত ও বড় দানা।

(৩) বিনাছোলা- ৩: আগাম, বট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগ সহনশীল ।

(৪) বিনাছোলা- ৪: উফশী, বট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগ সহনশীল, উজ্জ্বল বীজাবরণ।

পাট

(১) এটমপাট-৩৮: মাতৃজাত হতে ১৫%-২০% উচ্চ ফলনশীল। উপপত্র পাতায় রূপান্তরিত হওয়ার ফলে জাত চিহ্নিত করা সহজ।

(২) বিনাপাট-২: মাতৃজাত হতে ২০%-২৫% উচ্চ ফলনশীল। আঁশ উন্নত মানের এবং বেশী সাদা রং।

(৩) বিনাপাটশাক-১: বেশী শাক, প্রচুর ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ এবং রোগ প্রতিরোধ সহায়ক।

মুগ

(১) বিনামুগ-১: শীতকালীন জাত, সার্কোস্পোরা লিফ-স্পট ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।

(২) বিনামুগ-২: শীতকালীন জাত, সাকোস্পোরা লিফ-স্পট ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।

(৩) বিনামুগ-৩: শীতকালীন জাত, আগাম পাকে, খাটো গাছ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। জীবনকাল ৮০-৮৫ দিন। উচ্চ ফলনশীল।

(৪) বিনামুগ-৪: শীতকালীন জাত, আগাম পাকে, খাটো গাছ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। জীবনকাল ৭৫-৮০ দিন। উচ্চ ফলনশীল।

(৫) বিনামুগ-৫: গ্রীষ্মকালীন জাত, উফশী, হলুদ মোজাইক রোগ প্রতিরোধী।

মশুর

(১) বিনামশুর-১: উফশী জাত, বীজাবরণ কালো এবং ব্লাষ্ট রোগ প্রতিরোধী।

টমেটো

(১) বাহারঃ বড় ফল ও সুস্বাদু। শীতকালীন জাত।

(২) বিনাটমেটো-২: গ্রীষ্মকালীন জাত। ফল গোলাকার ও বেশী ফল ধরার জন্য হরমোন প্রয়োগ করতে হয় না।

(৩) বিনাটমেটো-৩: গ্রীষ্মকালীন জাত। ফল বড়, প্রায় গোলাকার ও বেশী ফল ধরার জন্য হরমোন প্রয়োগ করতে হয় না।

খেসারী

(১) বিনা খেসারী-১: দেশে প্রচলিত মাতৃজাত L-1 (Lathyrus-1) বেশী খেলে নিউরোটক্সিন রোগ হয়। কিন্তু উদ্ভাবিত নতুন জাতের বীজে মাতৃজাত L-1 এর বীজ হতে 'BOAA' নামক নিউরোটক্সিন বিষের পরিমাণ কম। এই জাতের ডাল বেশী খেলে স্নায়ুবিক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

মাষ

(১) বিনা মাষ-১: মাতৃজাত (বি-১০) হতে ৩১% বেশী উচ্চ ফলনশীল। জাতটি হলুদ পাতা ও পাতা পচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।

ড. আনোয়ারুল কাদের শেখ কর্তৃক বাংলাদেশে উপরোক্ত শস্যাদি ও সবজির ১৮টি উন্নত জাত উদ্ভাবন ও তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বি.আই.এন.এ স্থাপন এবং দেশী ও আন্তর্জাতিক কৃষিবিজ্ঞানীগণকে 'মিউটেশন প্রজনন পদ্ধতি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পৃথিবীতে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাঁর অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে "বাংলাদেশে শস্যের মিউটেশন প্রজনন স্থপতি" আখ্যা এবং এই মানপত্র প্রদান করা হল।

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা
ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট ও স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত
কৃষিবিজ্ঞানী এবং প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার
তারিখঃ ০৫ এপ্রিল, ২০২২ইং

ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা-একজন নিবেদিত কৃষিবিজ্ঞানী

ড. মোঃ সামসুল আলম

১৯৬২ সাল। আমি তখন তেজগাঁও কৃষি কলেজের ছাত্র। সবেমাত্র ভর্তি হয়েছি। অনেক কিছুই আমি বুঝতাম না। তখন আমার সিনিয়র ভাইদের নিকট থেকে মাঝেমধ্যে দুই-চারজন স্বনামধন্য কৃষি বিজ্ঞানীদের নাম শুনতাম। তাঁদের মধ্যে ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা ও ড. শাহ মো: হাছানুজ্জামান ছিলেন অন্যতম। সহপাঠী অনেকের কাছ থেকে আরও জানতে পারি যে দুজনেই খুব গুরুগম্ভীর লোক। আকৃতিতে দুজনে প্রায় একই রকম-ছোট খাট। দুজনেই তখন নাকি চুরুট খেতেন। সিনিয়রদের কথাবার্তায় আরও যা প্রচলিত ছিল তা হচ্ছে- তাঁদের দুজনকে সকলে ভয় করত এবং ছাত্ররা প্রায়ই তাঁদের এড়িয়ে চলতো। এ সব শুনে তাঁদের দুজনকে দেখার অদম্য আগ্রহ আমার মনে জন্মেছিল।

ড. হাছানুজ্জামান স্যারকে ছাত্র অবস্থায় দেখার সুযোগ হয়েছিল। তবে বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা শেষে দেশে ফিরে ড. বরুদ্দোজা স্যারের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৭৯ সালে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের Pesticide Standardization Committee মিটিংয়ে। তখন আমি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটে কীটতত্ব বিভাগে চাকুরি করতাম। আবার দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার জন্য স্যারের সাথে আমার আর দেখা হওয়ার সুযোগও হয়ে ওঠেনি। তবে ১৯৯২ সালে বিদেশ থেকে ফেরার পর স্যারের সাথে আমার আবার দেখা হয় ওনার উত্তরার বাসায়। আমি তখন উত্তরার বাসিন্দা। এই সুবাদে যখনই সুযোগ পেতাম তখনই স্যারের বাসায় যেতাম ও নানা বিষয়ে কথাবার্তা হতো। যার মধ্যে বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ও তার ভবিষ্যৎ ছিল একটা অন্যতম বিষয়। তখন দেখতাম তিনি ওই বয়সেও সব সময় বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ও কৃষির উন্নতি নিয়ে চিন্তা করতেন। তাঁর ধ্যান ধারণা নিয়ে অনেকের সাথে আলাপ করতেন। এ সব আলোচনার মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে কৃষি গবেষণা বিষয়ক অনেক কিছু আমি শিখেছি। তাই তাঁকে আমি আমার একজন মেন্টর মনে করি। সে সূত্রে তিনি যেন আমার friend-philisopher-guide বলা চলে। তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতায় আমার এ

প্রত্যয় জন্মেছে যে, বাহির থেকে আপাত: কঠিন মনে হলেও ভেতরে তিনি একজন নরম মনের মানুষ। তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতার আবর্তে জড়ালে যা সহজে অনুভব করা যায়। সহকর্মী কৃষিবিদদের উপকারের প্রশ্নে তাঁর মত দরাজ-দীল সত্যিই বিরল। মনের গভীরে তাঁর জন্যে তাই সাজানো আমার গভীর শ্রদ্ধার্ঘ। এ ছাড়াও স্যার সব সময় আমার পারিবারিক বিষয়ে খোঁজ খবর রাখতেন। যদি কোন কারণে ওনার সাথে আমার কিছুদিন দেখা সাক্ষাৎ না হতো তিনি বাসায় ফোন করে আমার গিন্নীর নিকট থেকে আমার খোঁজ খবর নিতেন।

আবার ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রায় এক বৎসর আমাকে পাকিস্তানের কোয়েটা ও হায়দ্রাবাদে বিশ্বব্যাংকের এক প্রকল্পে কাজ করতে হয়েছিল। তখন কাজের খাতিরে আমাকে ইসলামবাদের পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল যেতে হতো। সেখানে অনেকেই আমাকে স্যারের কথা প্রায় জিজ্ঞাসা করতেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে উনি শুধু মাত্র দেশেই একজন খ্যাতিমান কৃষিবিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত নন, বিদেশেও ওনার যথেষ্ট সুনাম আছে।

উনি শুধু মাত্র একজন কৃষি বিজ্ঞানী নন, উনি অত্যন্ত সফল পরিকল্পনাবিদ ও বাস্তবায়নকারী। তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা কৃষি গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে দেখতে পাই।

স্যার আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে কৃষির প্রতিটি ক্ষেত্র স্যারের উপস্থিতি জানান দেয়।

পরিশেষে আমি ওনার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

লেখক : ফাউন্ডার ফেলো, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্মরণে

ড. মোঃ আলী আকবর

মহান, ক্ষণজন্মা, বিরল ব্যক্তিসত্তার ধারক
আমাদের গর্ব এবং অহমিকার আবরণ,
ধরিত্রীর বুকে, এই বাংলার সেই শুভক্ষণে
যবে প্রয়োজন ছিল তব আগমন।

ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত, স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক প্রাণ
পারেনি কেহ কখনও টলাতে,
আদর্শের প্রতীক, দৃঢ় মনোবলের উদাহরণ তার
পারে নাই কেহ কখনও দলিতে।

দায়িত্বে সদা সচেতন, পরিশ্রমে কঠোর তিনি
একাই লড়ে গেছেন সারাটি জীবন,
তৈরি করে গেছেন এক বর্ণাঢ্য আপন ভূবন
কৃষিই তার জনম, কৃষিই তার মরণ।

মেধা, সামর্থ্য, সুযোগ, সবই ছিল তার
ডাক্তার, প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন সবার,
অথচ তিনি বেছে নিয়েছেন নিজ পেশা জেনে
অবহেলিত কৃষিকেই, মাতৃসম এ বাংলার।

তাই একের পর এক গড়ে তুলেছেন আপন কারিস্মায়
অনেক আধুনিক কৃষি উন্নয়নের প্রতিষ্ঠান,
কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
সবই ছিল এ কীর্তিমান মহানের অবদান।

আধুনিক কৃষির পথিকৃৎ তিনি, একথা সর্বজন বিদিত
উন্নয়নের নতুন মাত্রায় নিয়েছেন কৃষিকে,
তাই শত সহস্র প্রনতি জানাই মোরা এ পেশার সবাই
এক সফল নিবেদিত প্রাণ, সাধক বিজ্ঞানীকে।

আজ কৃষি পেয়েছে জনপ্রিয়তা বাংলার সবস্তরে
তিনি পেয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ সম্মান,
যদিও দেয়া হয়েছে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি তাঁকে
কিন্তু তার অবদানের নহে তো সমান।

তাই আমরা রেখেছি ধরে, তাঁকে মোদের অন্তরে
হৃদয়ের গভীর প্রকোষ্ঠে, সম্মানের শিখরে,
মোরা গর্বিত, অতিশয় আনন্দে উল্লসিত, কারণ
কিঞ্চিৎ তার দেয়া ঋণ, পেরেছি শোধিতে।

আজ নেই তিনি সশরীরে এ বাংলায় আমাদের মাঝে
চলে গেছেন তিনি তার না ফেরার দেশে,
পারিনি তাঁরে রাখিতে ধরে হৃদয়ে, মোরা আজীবন
আক্ষেপ মোদের অন্তরে, কষ্ট পাই শেষে।

আসুন, দোয়া করি মোরা ভগ্ন হৃদয়ে, সিক্ত চোখে
ডাকি করুণাময় ইহ-পরকালের মালিককে,
বেহেস্ত নসিব করুন যেন দয়াময় মহান আল্লাহ
কাজী বদরোদ্দোজা নামের এই মানুষটিকে।

লেখক : সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

Reminiscence of Dr. Kazi M. Badruddoza

Dr. Zahurul Karim

I first met Dr. Kazi M. Badruddoza in 1975 at the Rothamsted Experimental Station in the United Kingdom while conducting research for my Ph.D. program under a Commonwealth Scholarship. Dr. Badruddoza was visiting the institution as the Chairman of BARC to establish a collaboration between BARC and Rothamsted University. The Director of Rothamsted Experimental Station informed him that a Bangladeshi student was there pursuing a Ph.D. The Director then invited me to join a lunch organized for Dr. Badruddoza. Although it was my first meeting with him, I had known about him during my time at BAU as a student and later as a lecturer. Dr. Badruddoza, a slim and slight man, discussed my research in soil mineralogy with great interest. He was pleased and suggested that I return to Bangladesh after completing my Ph.D. to join the Bangladesh Agricultural Research Institute, which was under construction in Joydebpur, Gazipur.

Upon returning home in 1977, I submitted a report on the completion of my Ph.D. to the Registrar of BAU, who presented it to the university Syndicate. Dr. Badruddoza, a Syndicate member, immediately instructed the Registrar to advise me to meet him. I was surprised that he remembered me so vividly from our brief meeting at Rothamsted. Following his suggestion, I joined BARI in 1979 as Principal Scientific Officer and worked there until April 1986. Dr. Badruddoza advised me to focus on developing laboratory infrastructure in the newly established BARI.

Dr. Kazi M. Badruddoza had an illustrious career. He completed his Bachelor of Agriculture degree from Bengal Agriculture Institute (now Sher-e-Bangla Agricultural University) in 1948 and his Master of Agriculture degree from Dhaka University in 1952. He earned his Ph.D. from Louisiana State University, USA, in 1956, followed by postdoctoral research in genetics at Lund

University, Sweden, where he gained advanced knowledge in plant breeding and genetics. Starting his career as a Research Assistant at the Agricultural Research Laboratory in Pakistan, Dr. Badruddoza held numerous executive positions. He served as Executive Director of the Pakistan Agricultural Research Council, Executive Vice-Chairman of the Bangladesh Agricultural Research Council, Founding Director of BARI, and Chief Research Advisor to the Government of Vietnam.

During a critical period in our nation’s history, his groundbreaking work in agriculture transformed millions of lives and ensured food security for our country.

Dr. Badruddoza established the Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) in 1976 as a multi-crop research institute with several regional stations, serving as its founding Director. He also played a key role in strengthening and reorganizing the Bangladesh Agricultural Research Council (1983-84), establishing it as the apex body for agricultural research in Bangladesh. His efforts significantly contributed to developing the National Agricultural Research System (NARS) and improving research infrastructure to generate advanced agricultural technologies. Bangladesh's current self-sufficiency in agricultural production is a testament to Dr. Badruddoza's visionary leadership and dedication to infrastructural and human resource development in agriculture.

Additionally, Dr. Badruddoza contributed to the reorganization and strengthening of the Pakistan Agricultural Research Council (1960-1970) and the Council of Agricultural Science and Technology in Vietnam (1985-1988). He also contributed to the Institute of Genetics Research in Hanoi, Vietnam, in 1985.

Dr. Badruddoza authored numerous books, book chapters, reports, and national policy papers in agriculture. He received several prestigious awards, including the Tamgha-e-Imtiaz (TI) and Tamgha-e-Pakistan (TP) from the Government of Pakistan in

1968 and 1969, respectively; the Zebunnesa-Kazi Mahbubullah Gold Medal in 1982; and the Scientist Emeritus award for the NARS by the Government of Bangladesh in 1985.

He was also honored by the Government of the United States in 1985 for his leadership in BARC and NARS. Other notable awards include the Krishibid Institution Gold Medal in 1991, the D.Sc. (Honoris Causa) degree from Viswa Unnyayan Samsad, the Independence Day Award from the Government of Bangladesh in 2012, and the Channel i-Standard Chartered Bank Agro Award 2020 for lifetime achievement in agricultural research and development. He was also honored by the Bangladesh Horticulture Society.

Dr. Badruddoza was a fellow and member of numerous prestigious national and international professional bodies and societies, serving in various capacities such as chairman and coordinator. He was the founding member of the Regional Coordination Center for Research and Development of Coarse Grains, Pulses, Roots, and Tuber Crops (CGPRT) in the Humid Tropics of Asia and the Pacific, Bogor, Indonesia, and a Founder Trustee of the International Services for National Agricultural Research (ISNAR) in the Hague, Netherlands (1979-1984). He served on the Advisory Committee of the Tropical Products Institute (TPI), London (1977-1979), the International Federation for Agricultural Research and Development (IFARD), the Consultation Group of Agricultural Information Bank Asia (AIBA), the Task Force constituted by the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), and the Quinquennial Review Team of the International Rice Research Institute (IRRI), Manila, Philippines (1987). He was the first Chairman of the Agricultural Group of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).

I am deeply saddened by the passing of Dr. Kazi M. Badruddoza, the architect of Bangladesh agriculture. He was a true visionary and pioneering leader in agriculture and sustainable development.

His tireless efforts to ensure food security and improve the lives of our farmers will always be remembered.

His significant contributions to the establishment of numerous agricultural research institutes and the development of skilled manpower in the NARS of Bangladesh will be remembered forever.

Author : Former Secretary, Government of Bangladesh

স্মৃতির আখরে পথিকৃৎ বিজ্ঞানী কৃষিবিদ ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা

ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম[১]

ড. নির্মল চন্দ্র শীল[২]

ভূমিকা

প্রকৃতির লীলাভূমি এ পার্থিব জগৎটি অতীব সুন্দর, ঐশ্বর্যে ভরপুর, বৈচিত্রমন্ডিত রহস্যময় গ্রহ। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষসহ সকল প্রাণিকূল, উদ্ভিদজগৎ, অণুজীবসমূহের প্রিয় আবাসভূমি। অফুরন্ত সম্পদে বিভূষিত এ বসুন্ধরা। সৃষ্টিকর্তা তাঁর অপরূপ সৃষ্টির মাঝে সীমাহীন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে তাঁর পার্থিব সৃষ্টিতে উৎকর্ষতা বজায় রাখছেন। মানুষের মধ্যেও শক্তি-সামর্থ্য, মেধা-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনায় রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। মানুষ তার সুকৃতি ও সৌভাগ্য গুণে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ গুণাবলি অর্জন করে পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদেরই সৃষ্টিশীল কর্মে পৃথিবীর অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং মানবতা সুরক্ষিত হয়। খাদ্য মানুষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা। দেহের বৃদ্ধি, বিকাশ, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ, সুস্বাস্থ্য গঠন ও মেধা পরিস্ফুরণে খাদ্য প্রধান নিয়ামক। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কৃষির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এমতাবস্থায়, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে যারা অবদান রাখেন তাঁরা দেশের মুখ্য সেবক-মানবতার মহান সেনানী। এমন সৃজনে ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নের অগ্রপথিক যিনি আমৃত্যু নিরলসভাবে দেশের সেবা করেছেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় পথিকৃৎ এ কৃষি বিজ্ঞানী ৩০ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মানসে অত্র প্রবন্ধটি লেখার প্রয়াস করছি।

জন্ম ও শৈশব

স্মরণাতীত কাল থেকে এতদাঞ্চলের মানুষ দারিদ্রপীড়িত ও খাদ্য সমস্যায় জর্জরিত ছিল। হতদরিদ্র নিরন্ন মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য দরকার আধুনিক কৃষির প্রবর্তন। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাই মেধাবী ও দায়িত্বশীল কৃষি সেবকের। সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে দেশের বিভিন্ন ক্রান্তিকালে জন্ম নেয় বিশেষ মেধা-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্যবান, বিশেষ গুণ সম্পন্ন মানুষ। সৃষ্টির এমন মহৎ কার্যের ধারাবাহিকতায় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কাজী

এম বদরুদ্দোজা ১৯২৭ সালে বগুড়া জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এডভোকেট কাজী বদিউজ্জামান গাইবান্ধা কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। সেই সুবাদে বদরুদ্দোজা শৈশবে সেখানে বেড়ে ওঠেন যদিও তাঁর পূর্বপুরুষগণের আদি নিবাস ছিল ভারতের উত্তর প্রদেশের মিরাটে।

শিক্ষাজীবন

ড. বদরুদ্দোজা গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ হাইস্কুল থেকে ইংরেজিতে ডিস্টিংশনসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিকুলেশন পাশের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৫ সনে ভর্তি হন। কিন্তু দেশ বিভাগের কারণে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কৃষি অনুষদ তথা বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটে (বর্তমানে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন এবং ১৯৪৮ সনে কৃতিত্বের সাথে বিএজি সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৫২ সনে এগ্রিকালচারাল বোটানী বিষয়ে ১ম শ্রেণীতে মাষ্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং ১৯৫৭ সনে লুজিয়ানা স্টেট ইউনির্ভাসিটি থেকে প্ল্যান্ট প্যাথোলজি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. বদরুদ্দোজা ১৯৬০ সনে সুইডেনের লুন্ড ইনস্টিটিউট থেকে পোষ্টডক্টোরাল ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন

কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত ড. বদরুদ্দোজা ১৯৪৮ সনে এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে রিসার্চ এসিস্টান্ট হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় পিএইচডি অধ্যয়নের পর তিনি লুজিয়ানা স্টেট ইউনিভারসিটিতে ফ্যাকাল্টি হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেলেও পরিবার ও দেশের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার কারণে বিদেশের থাকার সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করে ১৯৫৭ সনে দেশে ফিরে আসেন এবং কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ইকোনমিক বোটানিষ্ট হিসাবে যোগদান পূর্বক তুলা, গম, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের উপর নিবিড় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। কর্মজীবনে শিক্ষা অর্জনের পথপরিক্রমায় সুইডেন থেকে পোষ্টডক্টোরাল ডিপ্লোমা করার পর তিনি ১৯৬১ সনে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পূর্বতন কর্মে পুনরায়

নিয়োজিত হন। তাঁর ভালো কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৬৪ সনে পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল (পিএআরসি)তে পরিচালক গবেষণা হিসাবে নিয়োগ পান এবং করাচি গমন করেন। সেখানে তিনি আমেরিকার নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ড. নরমান বোরলগ-এর সাথে কাজ করার সুযোগ পান। কীর্তিমান এ দুই বিজ্ঞানী মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন, রোগ প্রতিরোধী উচ্চ ফলনশীল গমের জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সাল নাগাদ পাকিস্তানে গমের উৎপাদন দ্বিগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৯৬৮ সনে তমঘা-ই-ইমতিয়াজ এবং ১৯৬৯ সনে তমঘা-ই-পাকিস্তান পুরস্কারে ভূষিত করেন। তাঁর অভূতপূর্ব অবদানের জন্য তাঁকে পাকিস্তানের সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয়। অতঃপর তিনি সেখানে মেইজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। যেটিকে পাকিস্তান তথা উন্নয়নশীল বিশ্বে এ ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সূতিকাগার হিসাবে অভিহিত করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে কর্ণ অয়েল, কর্ণ সিরাপ, কর্ণ ফ্লেকস ইত্যাদি উৎপাদন করার সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়াও তিনি পাকিস্তানের কৃষি গবেষণা সিস্টেমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এমন কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের নিন্দনীয় ভূমিকা ও পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত অন্যায়, অবিচার ও গণ হত্যার কারণে তিন চাকুরিতে ইস্তফা দেন। পাকিস্তান সরকার অন্যান্য বাঙ্গালি উচ্চপদস্থ অফিসারের সাথে তাঁকে পাকিস্তানে বন্দি করে রাখে। ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই ক্যাম্পে বন্দি থাকতে বাধ্য হন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবাসনের ছয় মাসের মধ্যে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পরিচালক (গবেষণা ও শিক্ষা) হিসেবে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি দেশের ভঙ্গুর কৃষি গবেষণা ও কৃষি শিক্ষা কার্যক্রমকে পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দেশের কৃষি গবেষণা সিস্টেম আধুনিকায়ন ও উচ্চমূল্য ফসলের উপর গবেষণা জোরদারকরণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় তিনি ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ শুরু করেন। উক্ত কাজের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ

করে। তিনি গাজীপুরে ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র, উপকেন্দ্র স্থাপনের জন্য নিরলসভাবে রাত-দিন পরিশ্রম করেন। ফলশ্রুতিতে তিনি বিএআরআই-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (বর্তমানে মহাপরিচালক) পদ অলংকৃত করেন। আজকে সববৃহৎ বহুবিধ ফসল গবেষণার প্রতিষ্ঠান বারি'র সকল অর্জন ও এর স্থাপনা ড. কাজী এম. বদরুদোজ্জার নিরলস পরিশ্রম ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ফসল। তাঁরই নির্দেশনায় গম গবেষণা কেন্দ্র (বর্তমানে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট), কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, ডাল গবেষণা কেন্দ্র, তৈল বীজ গবেষণা কেন্দ্র ও উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে তাঁরই পরিকল্পনা ও স্বপ্নের পথ ধরে উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র এবং মসলা গবেষণা কেন্দ্র পূর্ণ কলেবরে স্থাপিত হয়। ফলশ্রুতিতে দেশ আজ ফল-মূল, শাক-সবজি, আলু, ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের খাদ্য-পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের পথ সুগম হয়েছে। বিএআরআই প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) পুনর্গঠন করেন। তখন ঢাকার ফার্মগেটে বিএআরসি ক্যাম্পাসের স্থানটিতে পাঁচতারা হোটেল স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। ড. বদরুদ্দোজা এ কথা জানার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ঐ স্থানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বঙ্গবন্ধুকে মৌখিক ও লিখিতভাবে তুলে ধরেন। পরিপ্রেক্ষিতে ফার্মগেটের ঐ স্থানটিতে বিএআরসি স্থাপনের সরকারি অনুমোদন তিনি অর্জন করেন। এভাবে বিএআরসি অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাজ সমন্বয় করার জন্য একটি শীর্ষ সংস্থা (Apex-body) হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিএআরসি-এর নির্বাহী চেয়্যারম্যান থাকা অবস্থায় তিনি বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর বাস্তব রূপদানে তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও অনন্য নেতৃত্বের গুণে দেশে গুণগত মান সম্পন্ন উচ্চতর কৃষি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মানসে তিনি স্নাতকোত্তর কৃষি শিক্ষা ইনস্টিটিউট (আইপিএসএ) প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষির অনন্য এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমআরএইউ) নামে শিক্ষার উৎকর্ষতা বজায় রেখে চলছে। খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা

স্যারের অবদান অপরিসীম। গম ও ভুট্টার নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন এবং চাষাবাদ বৃদ্ধিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া, তাঁরই নেতৃত্বে এ দেশে সয়াবিন চাষ প্রবর্তন হয়। তিনি ১৯৮৫ সনে থাইল্যান্ড থেকে উচ্চ ফলনশীল পেয়ারার জার্মপ্লাজম নিয়ে আসেন এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যথাযথ গবেষণা ও বাছাইকরণের মাধ্যমে একটি উচ্চ ফলনশীল পেয়ারার জাত উদ্ভাবন করেন যেটি কাজী পেয়ারা নামে ব্যাপক সমাদৃত। তিনি রোগমুক্ত আলু এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি ও ফল ফসলের গবেষণা জোরদার করেন। তাঁরই উদ্যোগের পথ পরিক্রমায় আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ উদ্বৃত্ত, সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় এবং পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। তাছাড়া, ডাল ও তেল জাতীয় ফসল এবং আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা প্রভৃতি ফল ফসলের উৎপাদনও ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা ১৯৮৫ সনে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তিনি কৃষি গবেষণা থেকে নিজেকে বিরত রাখেননি। অবসরের ঠিক অব্যবহিত পরে তিনি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক মুখ্য উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ ও কৌলিতত্ত্ববিদ হিসাবে নিয়োগ পান এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামে গমন করেন। সে দেশে পাঁচ বছর কাল গবেষক হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি আন্তর্জাতিক কৌলিতত্ত্ববিদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ক্ষতিকর রাসায়নিক সহনশীল ধানের জাত এবং খরা ও রোগসহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভিয়েতনামের কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে ভিয়েতনাম কৃষি নির্ভর অর্থনীতির সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হয়। সফল গবেষক হিসাবে ভিয়েতনাম থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদন ও কৃষি শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেন। চাকুরিতে থাকাকালীন এবং চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সদস্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া, স্বদেশের বিভিন্ন গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক, উপদেষ্টা ও বোর্ডের সদস্য হিসাবে তাঁর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তিনি ১৯৯৪ সনে কৃষি, পশুসম্পদ, মৎস্য, বন প্রভৃতি সেক্টরের টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারকে যথোপযুক্ত নীতিনির্ধারণী পরামর্শ ও কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ দেয়ার জন্য

উপযুক্ত রিসার্চ ফেলো ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার (বিএএজি) প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া, উক্ত সংস্থা কৃষকদেরকে উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য এনজিওদেরকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। উক্ত একাডেমি কৃষি গবেষণায় অসাধারণ অবদান রাখার জন্য পুরস্কার প্রদান করে থাকে। ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা উক্ত একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। এবং আমৃত্যু উক্ত পদে বার বার নির্বাচিত হয়ে নীতিনিধারণী বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও সুপারিশ রেখে গেছেন।

স্বীকৃতি

বরেণ্য কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার অপরিসীম অবদানের জন্য তাঁকে বাংলাদেশের আধুনিক কৃষির জনক হিসাবে অভিহিত করা হয়। তিনি বাংলাদেশের একমাত্র ইমেরিটাস বিজ্ঞানীর মর্যাদা পান। তাঁর অবদানকে সম্মানিত করার জন্য বাংলাদেশে আবিষ্কৃত *Boletaceae* পরিবারের ছত্রাকের একটি প্রজাতি *Kaziboletus* হিসেবে নামকরণ করা হয়। বাংলাদেশের কৃষির সামগ্রিক অগ্রগতিতে তাঁর অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সনে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব "স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার"-এ ভূষিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি অসংখ্য (২০ এর অধিক) দেশি ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেন।

মৃত্যু

"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমরকে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবন-নদে?
সেই ধন্য নর কুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন"।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কবিতার মর্মবাণী সত্য প্রমাণিত করে ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা বিগত ৩০শে আগস্ট, ২০২৩ খ্রি. ৯৬ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন প্রথিতযশা পথিকৃৎ বিজ্ঞানীকে হারালো। তাঁর এ মৃত্যু দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি যা বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সকলের শোকবাণীতে প্রকাশিত

হয়েছে। কৃষিমন্ত্রীসহ কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে এমন দেশ বরেণ্য বিজ্ঞানীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। আমরাও এ লেখনীর মাধ্যমে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও শোক পুনর্ব্যক্ত করছিঃ

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে অভিভাবকহীন করে চলে গেলে
তুমি চিরতরে পরপারে।
তোমার আত্মার চিরঃশান্তির জন্য একান্ত প্রার্থনা জানাই
মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে।

উপসংহার

স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে দেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত করা ও পুষ্টিহীনতা দূর করে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা ছিল ড. কাজী এম বদরুদ্দোজার লালিত স্বপ্ন। যে স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি বহুলাংশে সফল হয়েছেন। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের পথেও ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। কৃষির এ অভূতপূর্ব উন্নতি ও অগ্রগতি টেকসইকরণের নিমিত্ত গবেষণার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি অনস্বীকার্য। বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করার জন্য রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়ন কাজে কৃষি গবেষণায় দক্ষ জনবল নিয়োগ ও তাঁদের গবেষণা পেশায় ধরে রাখা একান্ত অপরিহার্য। স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (এনএআরএস) ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণা সংক্রান্ত যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ও চাকুরিতে পদোন্নতিসহ প্রণোদনার ব্যবস্থাকরতঃ নিরলস এবং নিরুদ্বেগে গবেষণা কাজে আত্মনিয়োগ করার পরিবেশ তৈরির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি গবেষণা সিস্টেমে মেধাবী মানব সম্পদকে নিয়োগদানের সুব্যবস্থা করেছিলেন। বাস্তবে তাঁর এ স্বপ্ন অনেকটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অধরা রয়ে গেছে। যার ফলে মেধাবী বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানচর্চায় ধরে রাখা যাচ্ছে না। হয় তারা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন নতুবা কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করে প্রশাসনসহ অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসে যোগদান করছেন। চাকুরিতে উৎকর্ষতা ও যথাযথ

সামাজিক মর্যাদা না থাকাতে এখন আর মেধাবী মুখ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করার উৎসাহ বোধ করছেন না। ফলে গবেষণা সিস্টেমের উৎকর্ষতা বজায় রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা স্যার তাই তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে কৃষি বিজ্ঞানীদের চাকুরির প্রণোদনা বাস্তবায়নের জন্য সোচ্চার ছিলেন। যদি কৃষি গবেষণা সিস্টেমের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে হয় তবে অবশ্যই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ন্যায় পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনসহ ইনসিটো প্রমোশন পদ্ধতি প্রবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। আর যদি কোন কারণে তা করা সম্ভব না হয় তবে কৃষি গবেষণা সিস্টেমকে ক্যাডারভুক্ত চাকুরি কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করে চাকুরীর মানমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা জরুরি হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলে ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার উপরোক্ত লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ পথিকৃৎ বিজ্ঞানীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনকরতঃ দেশের সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন মর্মে আমরা প্রত্যাশা করি।

লেখক : [১]সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
[২]সাবেক পরিচালক, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা: বাংলাদেশের কৃষি উৎকর্ষের আলোকবর্তিকা

ওয়ায়েস কবির

গভীর দুঃখ ও শ্রদ্ধার সাথে আমি প্রয়াত ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখছি, যিনি বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে একজন আলোকিত মানুষ। তাঁর সাম্প্রতিক মৃত্যু আমাদের মাঝে একটি শূন্যতা এনে দিয়েছে যা পূরণ করা সম্ভব নয়। একজন সাধারণ কৃষি পেশাজীবী হিসাবে, আমি আমাদের দেশের কৃষিতে স্যারের অবদানের প্রতিফলন বিষয়ে কিছু কথা লিখছি। বাংলাদেশের কৃষিতে আরও যাঁদের অবদান রয়েছে আমি তাঁদেরও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ড. হাসানুজ্জামান, ড. মতলুবর রহমান, ড. নুর মোহাম্মদ মিয়া, ড. মুন্সি সিদ্দিক আহমেদ, ড. মামুনুর রশিদ, ড. আবদুল মান্নান, ড. এস ডি চৌধুরি, ড. আমিরুল ইসলাম, ড. এম. নুরুল আলম, জনাব শহিদুল ইসলামসহ অনেকে। তাঁদের অবদানে কৃষির গোড়াপত্তন ও সমৃদ্ধ হয়েছে। দেশের কৃষিপণ্যে তাদের নাম মিশে আছে আজও। আমরা এইসব নিবেদিত প্রাণ বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে দীক্ষিত হয়েছি।

১৯৭৮-৮০ সাল। তখন আমি কাউন্সিলের জুনিয়র কর্মকর্তা। ধানমন্ডির অফিসে কাজী স্যারকে দূরত্ব বজায় রেখে দেখতাম। পাতলা দেহী অসম্ভব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটি তখন থেকেই আমার মনে গেঁথে রয়েছেন। তখন তিনি সকল কৃষিকর্মীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। মিষ্টি গন্ধের চুরুট খেতেন আর স্বভাবসুলভভাবে গম্ভীর ও জ্ঞানসমৃদ্ধ কথা বলে নিজের বলয় বহুদূর বিস্তৃত করেছেন। তারপর এলাম ফার্মগেটের নতুন ভবনে। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী ও প্রশাসক। আবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু তার মাঝে যে বিশাল মায়া মমতা আর ভালোবাসা ছিল তা বুঝতে অনেক সময় লেগেছে।

ড. বদরুদ্দোজা নিছক একজন বিজ্ঞানী ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব যাঁর সারা জীবনের কাজ বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে এক

অমোঘ চিহ্ন রেখে গেছে। একজন কৃষিবিদ হিসাবে তাঁর যাত্রা কৃষকদের উন্নতি এবং টেকসই কৃষি পদ্ধতির বিকাশের জন্য একটি অটল প্রতিশ্রুতি তার অগ্রণী প্রচেষ্টা বাংলাদেশি কৃষির প্রতিটি দিককে স্পর্শ করেছে এবং পেশাদার বিজ্ঞানী এবং কৃষকদের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে। গবেষণা, শিক্ষা, সম্প্রসারণসহ সকল প্রজন্মের কাছে কাজী স্যার ছিলেন দীক্ষাগুরু।

বাংলাদেশি কৃষিতে ড. বদরুদ্দোজার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানগুলির মধ্যে একটি হলো প্রতিষ্ঠান গঠন। স্বাধীনতার পর বিশ্বমানের গবেষণা পদ্ধতি তৈরির অনেক কাজ উনি করেছেন। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচনা করে গেছেন যা আজও চলমান। বিশেষ করে বিজ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি জোর প্রচেষ্টা করেছেন এবং সফল হতে না পারায় আক্ষেপ করতে দেখেছি।

পেয়ারার জাত আবিষ্কার যা "কাজিপেয়ারা" নামকরণ নিয়ে কথা আছে। যিনি দেশের সকল উদ্ভাবনের গুরু তার অবদান শুধু পেয়ারার মধ্যে থাকবে কেন? তাঁর প্রিয়ভাজন বিজ্ঞানীগণ এ পেয়ারার জাত উদ্ভাবনের পর এ পেয়ারাাকে 'কাজি পেয়ারা' নাম দিয়ে উনাকে সম্মানিত করেছেন। যিনি কৃষির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, যে প্রতিষ্ঠান থেকে আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানীর জন্ম হয়, উনাকে শুধু একটি পেয়ারার জাত দিয়ে পরিচিত হতে হলে আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। উনার অবদানের প্রকৃত স্বীকৃতি আমরা দিতে পারিনি।

কৃষি ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি সংবাদকর্মীদের জন্য কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে সংবাদকর্মীরা পেশাভিত্তিক সংবাদ পরিবেশন করতে উৎসাহিত হয়েছন।

ব্যক্তিত্ব আর নেতৃত্বের গুণাবলিতে দেশের নীতিনির্ধারকদের মাঝে সম্মানিত ছিলেন বলেই সে সময়ের নীতি প্রণয়নে স্যারকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত।

টেকসই কৃষির প্রবক্তা

ড. বদরুদ্দোজা টেকসই চাষাবাদ অনুশীলনের জন্য একজন উৎসাহী প্রবক্তা ছিলেন। তিনি আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত

করার পাশাপাশি আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। তার গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টা বাংলাদেশে পরিবেশ বান্ধব কৃষি কৌশল গ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছে। তাঁর কাজ কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য অর্জনে জাতিকে নির্দেশনা দিয়েছে।

সর্বোচ্চ সম্মান

কৃষি বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ, ড. বদরুদ্দোজাকে ২০১২ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এই মর্যাদাপূর্ণ প্রশংসা আমাদের দেশের কৃষি ল্যান্ডস্কেপ গঠনে তাঁর কাজের স্বীকৃতি কৃষিকে উচ্চ আসনে তুলে ধরেছে। এটি এমন একজন ব্যক্তির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি ছিল যার উৎসর্গ এবং কৃতিত্ব অগণিত বাংলাদেশির জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী মহলে তার পরিচিতি ছিল ব্যাপক। যখন আমার সাথে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ড. স্বামীনাথনের সাথে কথা হত তখন তিনি কাজী স্যারের কুশল জানতে চাইতেন। যেদিন ১৯৯৯ সালে নোবেল জয়ী ড. নরম্যান বোরলগ ঢাকা এলেন তখন বিএআরসিতে যে অনুষ্ঠান হয় তাতে কাজী স্যার ছিলেন সাথে, যার সাথে কাজী স্যার এবং সুফি মহিউদ্দিন দেশের গম গবেষণায় একযোগে কাজ করেছেন। প্রযুক্তি বিরোধী কথাবার্তাকে একপাশে রেখে আগে খাদ্য নিরাপত্তার দিকে নজর দিয়ে বিজ্ঞানীদের কাজ করার আহ্বান জানান নোবেল বিজয়ী ড. নরম্যান বোরলগ। সেদিনের ঐতিহাসিক ছবিটি বড় করে বাঁধিয়ে কাউন্সিলের মূল ফটকে আমি ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম যখন আমি নির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেলাম। ছবিটা স্যার খুব পছন্দ করলেন। একদিন ডাকলেন স্যার আমাকে স্যারের বাসায়। বললেন "ছবিটা আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমি কি এই ছবিটা ছোট করে আমার বাসার জন্য একটি বাঁধাই করে দেবে"? একদিন ছবিটা নিয়ে স্যারের বাসায় গেলাম। জাকজমকহীন উত্তরার ছোট পরিসরের বাসায় দেশের কত মানুষ স্যারের সাথে দেখা করতে আসেন। সেদিন স্যার খুশি হয়ে আমাকে আর আমার পরিবারকে নিয়ে খাবার খেলেন। আমার পরিবার দেশের একজন বরেণ্য ব্যক্তিকে কাছ থেকে দেখে খুব আপ্লুত হয়েছিল।

একটি দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার

এই ব্যতিক্রমী কৃষিবিদকে হারানোর জন্য আমরা যখন শোক প্রকাশ করছি, তখন এটা মনে রাখা অপরিহার্য যে ড. বদরুদ্দোজার উত্তরাধিকার সেই কৃষকদের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছেন যাদের জীবন তিনি পরিবর্তন করেছিলেন এবং কৃষি পদ্ধতিতে তিনি বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তার জীবনের কাজ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কৃষি পেশাজীবীদের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। তার নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং দূরদর্শী নেতৃত্ব আমাদের সকলের অনুসরণ করার জন্য একটি উচ্চমান স্থাপন করেছে।

অগ্রসরমান কৃষি বিজ্ঞান

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার কৃষি বিজ্ঞানের জগতে যাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষি সম্প্রদায়ের উন্নতির গভীর-মূল আকাঙ্ক্ষার সাথে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং গবেষণা আমাদের কৃষি প্রধান জাতির সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করার মূল চাবিকাঠি। অটল উৎসর্গের সাথে, তিনি কৃষি বিজ্ঞানে উন্নত অধ্যয়ন করেছিলেন এবং উন্নত দেশ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন এবং একটি অসাধারণ কর্মজীবনের জন্য মঞ্চ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে ড. বদরুদ্দোজা বাংলাদেশের কৃষি গবেষণার অগ্রভাগে ছিলেন। মাটি ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে শস্য বৈচিত্র্য এবং কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ থেকে সেচ কৌশল পর্যন্ততার কাজ বিস্তৃত ছিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদান শুধু কৃষি উৎপাদনশীলতাই বাড়ায়নি বরং আরও টেকসই ও স্থিতিস্থাপক কৃষি খাতের দিকে পরিচালিত করেছে। তাঁর গবেষণার ফলাফলগুলি বাংলাদেশের আধুনিক কৃষির মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে, যা পরিবর্তনশীল জলবায়ু দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলিকে প্রশমিত করার সময় কৃষকদের তাদের জমির পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সক্ষম করে।

কৃষকদের ক্ষমতায়ন

সম্ভবত ড. বদরুদ্দোজার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকারের মধ্যে একটি হলো কৃষকদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র চাষীদের ক্ষমতায়নের জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি তাঁর কৃষক সম্প্রদায়ের মঙ্গলের উপর নির্ভরশীল।

এ লক্ষ্যে, তিনি দেশের প্রতিটি প্রান্তে কৃষিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রবলভাবে কাজ করেছেন। তাঁর আউটরিচ প্রোগ্রাম এবং প্রশিক্ষণ উদ্যোগ কৃষকদের সর্বোত্তম অনুশীলন গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে, যার ফলে তাদের জীবনযাত্রার উন্নতি হয়েছে।

তিনি কৃষিতে নারীদের চ্যাম্পিয়নরূপে দেখতেন, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য সমর্থন করেছিলেন। তিনি শুধু নারীদের ক্ষমতায়নই করেননি বরং গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সামগ্রিক কাঠামোকেও শক্তিশালী করেছেন।

খাদ্য নিরাপত্তার জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি

ড. বদরুদ্দোজা বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁর গবেষণা এবং নীতি সুপারিশগুলি আমাদের জাতির জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বল্পমেয়াদি সমাধানের বাইরেও প্রসারিত হয়েছে, কারণ তিনি ভবিষ্যতের জন্য আরও স্থিতিশীল খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল নিশ্চিত করে, বাহ্যিক ধাক্কাগুলির বিরুদ্ধে স্থিতিস্থাপকতা তৈরির এবং ফসলের বৈচিত্র্যকরণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।

একজন পরামর্শদাতা এবং অনুপ্রেরণা

ড. বদরুদ্দোজা শুধু একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণ গবেষক এবং কৃষি পেশাজীবীদের জন্য একজন পরামর্শদাতা এবং অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর নম্রতা, উৎসর্গীকরণ এবং শ্রেষ্ঠত্বের নিরলস সাধনা তাদের জন্য একটি পথ-নির্দেশক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছিল যারা কৃষিক্ষেত্রে একটি পার্থক্য তৈরি করতে আকাঙ্ক্ষিত। তিনি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করেছেন এবং প্রতিভা লালন করেছেন, তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উৎসাহী ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।

উপসংহারে বলা যায় বাংলাদেশের কৃষিতে ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার অবদান বই এবং গবেষণাপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং দেশের উর্বর মাটি এবং সমৃদ্ধ খামারগুলিতে গভীরভাবে সংমিশ্রিত। আমরা যখন এই মহান আত্মাকে বিদায় জানাচ্ছি, তখন আমরা তার অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য অসীম কৃতজ্ঞতার সাথে তা করি, যা আমাদের কৃষি ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বাংলাদেশের জন্য আরও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করেছে। তাঁর স্মৃতি চিরকাল ধরে রাখতে আমাদের কৃষকদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে।

কাজী স্যারের সীমানার কাছে যেতে পারব না কোনোদিন, তবু ভোগ বিলাসহীন সাধারণ জীবন যাপন করেও গর্ব নিয়ে দেশের কাজ করতে শিখেছি, সেটা কম কি?

লেখক : প্রাক্তন নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

Dr Kazi M Badruddoza: a saviour of the hungry millions

Jiban Krishna Biswas

Extraordinarily brilliant in his academic pursuits as a student, Kazi M Badruddoza could have opted for a career as an advocate, an engineer, or a physician and acquired prosperity and reputation. He belonged to the third generation of Indian freedom fighters from a family with a legacy of the Nawabs, who had actively participated in the Sepoy Mutiny of 1857 against the then-British rulers. The family, in the sad aftermath of the failed mutiny, was forced to seek asylum in the northern part of the then-Bengal presidency. Despite his aristocratic lineage, which was aloof from farming and farmers, Dr. Kazi M. Badruddoza preferred to be an agricultural scientist and got himself admitted to the Bengal Agricultural Institute in 1945. It was a perfect choice for a young man who had a dream to free the toiling millions in his native land from the pangs of hunger and poverty. In due course, he had academic accomplishments from the MAg to the PhD degree and more from famous universities worldwide. I am not going to explain those in detail here. I intend, rather, to disclose in brief what this visionary scientist, mentor, and guide philosopher, Dr. Badruddoza, has done for the nation. If he were a litterateur or a politician, his 50th birthday would have been observed encouragingly by a group of intellectuals in the country. We should have rather celebrated his 50th and 75th birthdays to reminisce about his contributions to the nation. He is just a man of intelligence who worked all his life as the saviour of the hungry millions. He contributed enormously to research and development in agriculture. However, only a few of his close associates know about his real contributions. Even most of us, who have been working as agricultural scientists in Bangladesh for a long time, do not know that he was adored with the highest distinction in the country: the Independence Day award a few years ago. He was also honoured as an Emeritus Scientist of the country. With his immense contributions and accomplishments in a long, successful

career, Dr. Badruddoza, today, is a person and personality who will be remembered as a highly esteemed celebrity.

Dr. Badruddoza began his career as a Research Assistant in 1948 at the Agricultural Research Laboratory, Dhaka. Thereafter, as a Fulbright scholar, he obtained his PhD from Louisiana University in 1957. Regretting the lucrative offer to be a teacher at the same university, he came back home and resumed his research career as an Economic Botanist (Fibre Crops except jute). He also had to deal with wheat, corn, and tobacco. He was quite optimistic regarding the introduction of less popular wheat and corn in his then homeland, East Pakistan. To keep up the spirit, he availed himself of the opportunity to work as a postdoctoral fellow at Lund University, Sweden, in 1960. He came back home in 1961 to resume his job with great enthusiasm. Just a few years later, he was appointed Director of Research at the Pakistan Agricultural Research Council (PARC) in Karachi, where he worked for seven years (1964–1971). Dr Badruddoza was one of the close associates of Dr Norman Borlaug, a Nobel Laureate for Peace, the initiator of the Green Revolution all over the hungry world through the discovery of the short-statured high-yielding wheat varieties. Dr Badruddoza was the father of the Green Revolution in Pakistan, the same as his counterpart, Dr MS Swaminathan of India. His visionary leadership played a significant role in establishing a Maize Research Institute under the care of the private sector, the first of its kind not only in Pakistan but also all over the developing world. He quit his job as the Executive Director of PARC during our liberation war. The Pakistani government confined him with other high officials of Bengali origin in a concentration camp until his repatriation to Bangladesh in 1973. After six months of repatriation, he was appointed Director of Agriculture (Research and Education). The renovation and reconstruction of the shaky agricultural system through sound R&D after the liberation warwere the demands of the day. Bangabandhu very wisely and optimistically selected Dr. Badruddoza for appointment to the position of Director (equivalent to present-day Director-General) of the Bangladesh

Agricultural Research Institute. In addition to that, he was offered the position of Executive Vice Chairman/Chairman of the Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), a blooming canopy organisation to oversee all the agricultural research institutions in Bangladesh. He was the strength and inspiration for the establishment of the BARC. As a research administrator, he extended his wholehearted support to Dr Sufi Mohiuddin who was in charge of the wheat programme at the initial stage in Bangladesh. Bangladesh had significant success in the extension of wheat acreage after their initiative. Dr Borlaug appreciated this fantastic accomplishment in those critical days of food shortage. The man behind the success of maize cropping in Bangladesh is also Dr Badruddoza. As a profitable and climate-resilient crop, maize has the potential to replace rice in many areas of northern Bangladesh.

Dr Badruddoza's contributions to the establishment of BARI as an autonomous body required new rules and regulations formed through the brainstorming of different ministries without hampering the interests of the existing employees. That was a huge task. At the same time, he had to oversee infrastructure development at the headquarters and different regional research centres as well. As Chairman of BARC, he played a leading role in establishing the Bangladesh Livestock Research Institute and the Bangladesh Fisheries Research Institute. The Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture would not have been in its present form without the blessings of Dr Badruddoza. He is the man behind the establishment of the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University.

During the Pakistani regime, he was a member of the Agricultural Research Coordination Board, Government of Pakistan (1964–1971), Central Jute Committee (1966–1971), Pakistan National Science Council (1961–1971), Pakistan-American Joint Agricultural Research Evaluation Team (1968), and Central Cotton Committee (1968–1971). After the independence, he was a member of the Board of Governors of Bangladesh Rice

Research Institute (1976–1985), Bangladesh Jute Research Institute (1971–1983), Syndicate member, Bangladesh Agricultural University (1974–1985), Senate member of Dhaka University and Rajshahi University, and Member of the Advisory Board, Bangladesh Atomic Energy Commission (1980–1984). In the international arena, he was a member of the Advisory Committee, Tropical Products Institute, London (1977–1979), Consultative Group of International Agricultural Research, International Bank for Asia, Manila (1979–1984), Trusty Board, International Service for National Agricultural Research, The Hague (1979–1984), Team for Quinquennial Review of the International Rice Research Institute, Manila (1989), and Governing Board of the Regional Coordination Centre for Research and Development of Coarse Grain, Pulses, Roots, and Tuber Crops in the Humid Tropics of Asia and the Pacific (1984). He is a Bangladesh Academy of Science Fellow and President of the Bangladesh Academy of Agriculture. This indeed speaks volumes about the footprints of a man in the whole arena of agricultural research and development in this part of the world. So, which organisation was there that was not blessed by the refreshing touches of leadership, initiative, and drive of Dr. Bardruddoza?

Age did not matter to him. He was leading an isolated life in a contemplative mood in this crowded city of Dhaka. During the COVID period, his movement was restricted, but he consistently provided thoughtful directives for the development of agriculture. Still, he enjoyed attending professional meetings, where he used to share his thoughts and experiences. Undoubtedly, he was a living legend who took on the responsibility of feeding the hungry nation long ago. The nation must fondly remember Dr. Badruddoza with gratitude for his extraordinary services.

Author : Former Director General, Bangladesh Rice Research Institute
Former Executive Director, Krishi Gobeshona Foundation

কৃষির কিংবদন্তী আমাদের কাজী স্যার

কৃষিবিদ ড. মোঃ হামিদুর রহমান

ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা আমার দেখা একজন বিরল ব্যক্তিত্ব। তীব্র-তীক্ষ্ম মেধা ও বুদ্ধির দীপ্ত এবং প্রবল প্রাণশক্তির অধিকারী একজন নিরেট বাস্তববাদী মানুষ। জনারণ্যে এমন মানুষের দেখা মেলা ভার। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী এই মানুষটির দূরদৃষ্টি, কর্মক্ষমতা ও সম্পাদিত কাজের সাফল্য বিস্ময়কর। 'কাজী স্যার' এই সম্মানীয় সম্বোধনে অভিষিক্ত বাংলাদেশের কৃষিবিদ সমাজের অগ্রপথিক তিনি। শতবর্ষ ছুঁই ছুঁই দীর্ঘজীবনে তিনি কৃষি উন্নয়নে যে অবদান রেখে গেছেন তা প্রজন্ম প্রজন্ম ধরে এ দেশের মানুষের কাছে, বিশেষ করে কৃষিবিদদের কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। কাজী বদরুদ্দোজা বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের ইতিহাসের অনিবার্য অংশ। এ দেশে যতদিন কৃষিবিজ্ঞানের চর্চা থাকবে ততদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি।

আমি কাজী স্যারের নামের সাথে পরিচিত হই ১৯৭৭ বা ৭৮ সালে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে অধ্যয়নকালে। তখন দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন। এ আন্দোলনের সাথে ছিলেন ড. আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফউদ্দিন, ড. মুহম্মদ ইব্রাহীম, ড. মোবারক আলী খান, ভূঁইয়া ইকবাল প্রমুখ। আমরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও "অনুশীলন বিজ্ঞান ক্লাব" নামে একটি ক্লাব গড়ে তুলি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় অধ্যাপক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হোসেন স্যারের নেতৃত্বে। তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলাই এ আন্দোলনের লক্ষ্য। মুহাম্মদ হোসেন স্যার ছিলেন প্রাণরসায়নের অধ্যাপক এবং শহীদ শামসুল হক হলের ওয়ার্ডেন। আমি ঐ হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম। এই সুবাদে স্যারের নজরে পড়ি। মুহাম্মদ হোসেন স্যার ক্লাবের কাণ্ডারি অর্থাৎ সভাপতি। তাঁর অনুপ্রেরণায় তরুণ শিক্ষক জনাব আমিনুল্লাহ মিহির, মোঃ হাবিবুর রহমান, গোলাম সরোয়ার জাহাঙ্গীর, আব্দুস সাত্তার, মহিবুল হাসান বুলবুল, বন্ধু মজিবুর রহমান এবং আমার রুমমেট মেহেরুল হাসানসহ অনেকেই এ বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য হন। আমার উপর অর্পিত হয় এ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। ক্লাবের পক্ষ থেকে "নিরীক্ষা" নামে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা

প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। এ পত্রিকার সম্পাদক হন আমাদের হলেরই অগ্রজ মহিবুল হাসান বুলবুল ভাই। স্টেন্সিল পেপারে টাইপ করে সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছাপিয়ে এ পত্রিকা বের করা শুরু করা হয়। পরে প্রেস থেকে মুদ্রণ করেও 'নিরীক্ষা' প্রকাশ করা হতে থাকে। মুহাম্মদ হোসেন স্যার এই পত্রিকা ঢাকায় কর্মরত উচ্চপদস্থ কৃষিবিজ্ঞানীদের পাঠানোর তাগিদ দিতে থাকেন। কার কার কাছে পত্রিকা পাঠানো হবে তিনি তার একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। স্যারের নিজ হাতের লেখা ঐ তালিকার শীর্ষে যার নাম ছিল তিনি হলেন ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা। আমি কৌতূহলবশত কাজী বদরুদ্দোজা সম্পর্কে মুহাম্মদ হোসেন স্যারের কাছে জানতে চাইলে তিনি চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালেন, সস্নেহ ভর্ৎসনা সহযোগে বললেন- গাধা কোথাকার, ড. কাজী বদরুদ্দোজার নাম জানো না, আবার কৃষিবিজ্ঞান পড়তে এসেছো? তারপর বিস্তারিতভাবে কাজী স্যারের কীর্তির বর্ণনা করলেন তিনি। আমি সেই যে মুগ্ধ হয়ে কাজী স্যারের কথা শুনলাম, জানলাম এরপর থেকে কাজী স্যার সম্পর্কে এই জানাশোনার আগ্রহ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমার মধ্যে অটুট ছিল।

আমি কাজী স্যারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পাই ২০১২ সালের পর। এ বছর আমি আমার বাসা মোহাম্মদপুরের আদাবর থেকে উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরে স্থানান্তর করি। তখন আমি উত্তরার কৃষিবিদ এসোসিয়েশনের সদস্য হই। যেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কাজী স্যারের উপস্থিতি সূত্রে তার নৈকট্য লাভের সুযোগ পাই। তখন আমি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট 'দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের (এসসিডিপি)' প্রকল্প পরিচালক। যে প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ছিল প্রকল্প এলাকায় উচ্চমূল্যের ফসলের আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন। কাজী স্যারের সাথে পরিচিত হওয়ার সুবাদে তার কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ পাওয়ার প্রত্যাশায় স্যারের বাসায় যাতায়াত শুরু করি। আমি স্যারকে একদিন প্রশ্ন করি- অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হয়েও তিনি ঐ সময় যখন মানুষ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার হতে উৎসাহী হতো সে সময় কৃষি বিজ্ঞান পড়তে আগ্রহী হলেন কেন? তার জবাব ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত বিস্ময়করভাবে দেশপ্রেম ও মানব কল্যাণের অঙ্গীকারদীপ্ত উচ্চারণ। তিনি জানান যে, তাদের গ্রামে ক্ষেতে খামারে অতি গরীব কৃষি শ্রমিকরা কাজ করতো, তাদের মধ্যে সাঁওতালরাও ছিল।

তিনি তার কৈশরে তারুণ্যে অত্যন্ত বেদনার সাথে এদের অভাব অনটন দেখেছেন এবং বুঝেছেন যে কৃষির উন্নতি করা না গেলে এ অভাব কাটবে না। খাদ্যই মানুষের আসল চাহিদা, আর খাদ্য আসে মূলত কৃষি থেকে, তাই তিনি কৃষি বিজ্ঞান পড়েছেন সচেতন ভাবে।

উত্তরার ৫ নম্বর সেক্টরের ৫/এ রোডের **১১** নম্বর বাড়িটিতে স্যারের বসবাস। বাড়িটির নাম 'তাসনিম ভিলা'। সাড়ে তিন কাঠা জমির উপর অত্যন্ত সাদামাটা নিরাভরণ একটি বাড়ি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের লাল ইটের ভবনের অনুকরণে প্লাস্টার রংচংহীন ঐ অতি সাধারণ বাড়িটির একটি অংশে চিলেকোঠাসদৃশ দোতালা ঘর। যে ঘরটিতে স্যার রাতে ঘুমাতেন। আর সারাদিন কাটাতেন ঐ শোয়ার ঘরটির ঠিক নিচের বসার ঘরটিতে। যে ঘরটির একপাশে একসেট সোফা, দুটি চেয়ার, দুটি টুল, একটি ডাইনিং টেবিল ও ডাইনিংয়ের পাশে একটি টয়লেট এবং রান্নাঘর ছিল। আর ছিল একটি বেডরুম। স্যার প্রায় সারাদিন বসার ঘরটির সোফায় আধা শোয়া ভঙ্গিতে থাকতেন। ঘরের দুপাশের দেয়ালে স্যারের কয়েকটি পারিবারিক ছবি, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্তির সনদ টাঙানো ছিল। নব্বই বছর উত্তীর্ণ একজন মানুষ, সম্পূর্ণ আত্মীয় পরিজনহীনভাবে শুধু সাহায্যকারী পরিচারকের সহায়তায় এমন জীবনযাপন করতে আমি আর কাউকে দেখিনি। আশীষ এবং নাজু স্যারের দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তাদের মধ্যে আশীষ সার্বক্ষণিক সকল কাজে এবং নাজু রান্নাবান্না, ঘরবাড়ি পরিষ্কারসহ কাজী স্যারের কাপড় চোপড় পরিষ্কার করার দায়িত্বে পালন করতেন। তারা স্যারের নি:সঙ্গ ও অসুস্থ অবস্থায় সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে যে দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না। সেই সাথে আরতি ও এখলাসের কথা বলা দরকার। এরা দুজন স্যারের অফিসিয়াল কাজে একান্ত সাহায্যকারী হিসেবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। স্যার অসুস্থ হয়ে পড়লে আরতিকে দেখেছি স্যারকে নিয়মিত মুখে তুলে খাবার খাওয়াতে। মমতা-মাখানো সম্পর্কের এসব বিরল দৃষ্টান্ত।

বাড়িটিতে স্যারকে দেখা, স্যারের খোঁজখবর নেয়ার উদ্দেশ্যে যাতায়াত একসময় আমার অভ্যাসে পরিণত হয়। যখনই স্যারের সামনে গেছি তিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে অভ্যর্থনা করেছেন। সবসময় কুশল জানতে চেয়েছেন আমার

বৃদ্ধ বাবা-মায়ের। ২০১৬ সালে আমার বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি নিয়মিত টেলিফোন করে বাবার খোঁজখবর নিতেন। আমাকে শান্ত ও শক্ত থেকে বাবার চিকিৎসা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করতেন। বাবার মৃত্যুর পর কাজী স্যারের বাসায় আমার যাতায়াত আরও বেড়ে যায়। আমি তার পরম স্নেহে নিরন্তর স্নাত হতে থাকি। সে সময় কাজী স্যারের কাছে গিয়ে গল্প শুনি, কৃষি উন্নয়নের গল্প, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের আন্তঃসমন্বয়ের কথা, উচ্চমূল্যের ফসল বিশেষ করে নতুন গবেষণার বিষয়, নানা ফসলের উন্নত জাত এবং সেসব জাতের চাষ বৃদ্ধি বিষয়ে। তার ছিল অদম্য জানার ইচ্ছা, কৃষি নিয়ে সীমাহীন কৌতূহল। কৃষির বাইরে আর কোন কিছুর প্রতি কাজী স্যারের তেমন কৌতূহল দেখিনি। কাজী স্যারের বাসায় যাতায়াতের সুবাদে এ দেশের বহু বিখ্যাত মানুষের সাথে আমার চেনা জানা হয়। কৃষি বিজ্ঞানী, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাবেক আমলা এবং কৃষির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা স্যারের খোঁজ খবর নিতেন। আমাদের দুজন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ও ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে স্যারের পায়ে হাত দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখেছি।

স্যারের উত্তরার বাড়িতে একটি আম্রপালি ও আরেকটি মল্লিকা জাতের আমগাছ আছে। এ দুটি গাছের চারা দিল্লি থেকে এনে লাগিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আম্রপালি জাতটি বারী আম-৩ নামে রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হয়। কৃষিবিদ এনামুল হক যখন ডিএই'র মহাপরিচালক ছিলেন তখন এ জাতটি বাংলাদেশে সম্প্রসারণে যে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন এ বিষয়ে কাজী স্যার অবহিত ও উৎসাহী ছিলেন। তিনি বারী আম-৪, বারী মাল্টা-১, বিভিন্ন জাতের বরই, ড্রাগন ফল, কাজুবাদাম, এমনকি অ্যাভোকাডো ফল বাংলাদেশে উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে খুব আগ্রহী ছিলেন। এমনকি ভুট্টা থেকে কেন ভোজ্যতেল উৎপাদন করা হচ্ছেনা সে বিষয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তিনি কৌতূহলী ছিলেন। কোন অনুষ্ঠানে দেখা হলে তার একদা সহকর্মী পরম স্নেহের পাত্র মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাককেও তিনি তার এসব ইচ্ছের কথা বলতেন।

কাজী স্যার ফসলের মাঠ দেখতে খুব আগ্রহী ছিলেন। তার শারীরিক সক্ষমতা বিষয়টি উপেক্ষা করে অনেক সময় তিনি শিশুর মতো মাঠে

যাওয়ার জন্য বায়না ধরতেন। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী যশোর-চুয়াডাঙ্গা এলাকার কৃষির অগ্রযাত্রা দেখতে যাবেন এটা জানতে পেরে তিনিও যাওয়ার জন্য তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কাজী স্যারের অতি নিকটজন সুপ্রিম সিড কোম্পানির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাসুম ও কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক মহোদয়ের পরামর্শে শারীরিক ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আমি ও ড. ফেরদৌসি তাকে চুয়াডাঙ্গা যাওয়া থেকে নিবৃত করি।

মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগেও তিনি রংপুর-গাইবান্ধায় যান। এ সফরের সময় গোবিন্দগঞ্জে যেখানে স্যারকে কবর দেয়া হয়েছে সে জায়গাটি তিনি নিজেই চিহ্নিত করে নিকটজনদের আগাম নির্দেশনা দেন। কতটা প্রবল মানসিক শক্তি থাকলে মানুষ চলৎশক্তিহীন হয়েও এমন ইচ্ছা বাস্তবায়নে তৎপর থাকতে পারেন সেটা বিস্ময়কর। আমাদের কাজী স্যার এমনই প্রবল মনোবল-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিরল দৃষ্টান্ত।

এক সময় কাজী স্যার আমাকে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচারের (BAAG) সদস্য হতে অনুপ্রাণিত করেন। তার অভিপ্রায়ে আমি এ প্রতিষ্ঠানের ফেলো এবং পরবর্তী সময়ে নির্বাহী কমিটির সদস্য হই। এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে দায়িত্বপালনকারী অগ্রগণ্য কৃষিবিদদের সংগঠন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে আমৃত্যু নেতৃত্ব প্রদান করেন। তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বহু সভায় আমি অংশগ্রহণ করেছি যেখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বুদ্ধি-পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। যে কোন সভা বা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত হলে নির্ধারিত সময়ের আগে উপস্থিত থাকা ছিল তার অনন্য অভ্যাসের অন্তর্গত, যা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। কাজী স্যারের ইংরেজি বলা ও লেখার ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছি, তিনি বার্ধক্যে উপনিত হয়েও ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারতেন। তিনি কৃষির নতুন নতুন আবিষ্কার বিশেষ করে ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এ বিষয়ে স্টলওয়ার্ড নামে একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কেআইবিতে আয়োজিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে আমি তাকে সঙ্গ দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করি।

স্যার দেশজ মৌসুমি ফল খেতে খুব পছন্দ করতেন। আর সে সময় কোন ফলের কি গুণাগুণ সে বিষয়ে অবলীলায় কথা বলতেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম আমরা ওই বয়সে তার মতো স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন থাকতে পারব কি না?

কাজী স্যারের মানবিক গুণেরও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আশীষ নামের যে ছেলেটি স্যারকে দেখভাল করত ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। কৃষি গবেষণার কোনো প্রতিষ্ঠানে ছেলেটির স্থায়ী চাকরি হোক স্যার জীবদ্দশায় সেটা দেখে যেতে চেয়েছিলেন। আমরা যারা ঘন ঘন স্যারের কাছে যেতাম, তিনি সকলকে বলতেন 'আমি চলে গেলে আশীষের কী হবে?' তোমরা কেউ কিছু করছো না কেন ওর জন্য। পরবর্তীতে আশীষকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়া হলে তিনি খুব খুশি হন।

কাজী স্যার ছিলেন দেশপ্রেম, বিজ্ঞান মনস্কতা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, সমায়নুবর্তিতা এবং সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে মূর্ত প্রতীক। ২০১০ সালের পর থেকে তিনি তার স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারতেন না। তার দুই হাঁটু প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল। হুইল চেয়ারে বসে মাঝে মাঝেই কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) ইমেরিটাস সায়েন্টিস্টের কক্ষটিতে বসতেন। কোনো অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিলে খুব খুশি হতেন। উত্তরা কৃষিবিদ এসোসিয়েশনের প্রায় সকল অনুষ্ঠানে তিনি হাজির থাকতেন। ২০২৩ সালের ১৩ জানুয়ারী আমরা দেশের তরুণ শিক্ষিত কৃষি উদ্যোক্তাদের সম্মেলনের আয়োজন করি। এ আয়োজনে কাজী স্যার ছিলেন প্রধান অতিথি। এরপর তিনি ওই অনুষ্ঠানে কৃষি উদ্যোক্তা কল্যাণ ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার সম্মতি জানান।

আসলে এমন প্রবল জীবনীশক্তিসম্পন্ন মানুষ সত্যিই দুর্লভ। আমার একান্ত বিশ্বাস ছিল স্যার শতায়ু হবেন। প্রতিবছর পহেলা জানুয়ারি আমরা স্যারের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে গেলে তিনি মুচকি হেসে বলতেন, "এটা আমার প্রকৃত জন্মদিন নয়। মাস্টার মশায়দের বানানো জন্মদিন।" তার প্রকৃত বয়স আরো বেশি। আমি বলতাম, স্যার আমরা আপনাকে নিয়ে আপনার জন্মশতবর্ষ পালন করব। তিনি হাসতেন। দুর্ভাগ্য যে, সে সুযোগ আর

আমাদের হল না।

২০২০ সালের ১৬ নভেম্বর ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে আমার মা বোধশক্তি হারিয়ে বিছানগত হন। সেই কোভিড-১৯-এর সংক্রমণের মধ্যে আমি মাকে নিয়ে যখন বিভিন্ন হাসপাতালে ছুটাছুটি করছি তখন প্রায়ই কাজী স্যার আমাকে ফোন করে বলতেন 'হামিদুর রহমান, তোমার মা এখন কেন আছেন?' এমন পুরো নাম ধরে কেবল আমার বাবা আমাকে ডাকতেন। গত ৩০ আগস্টে আমার পুরো নাম ধরে ডেকে পরিবারের কুশল জানতে চাওয়া একজন অতি আপনজনকে আমি হারিয়েছি। কাজী স্যার ২০২৩ সালের আগস্টের ২০ তারিখের পর থেকে ঠান্ডাজ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তখন ঢাকার বাইরে পটুয়াখালিতে। দুদিন পর ২২ তারিখে মুহাম্মদ মাসুম স্যার আমাকে কাজী স্যারের শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর জানান। স্যারকে হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এ বিষয়ে সবসময়ই স্যারকে রাজী করানো মুশকিল হতো। স্যার কখনোই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে থাকতে চাইতেন না। মাসুম স্যারের পর কাজী স্যারের সন্তানতুল্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ভাই ফোন করে আমাকে স্যারের অসুস্থতার কথা জানান। আমি বললাম আমি আজই ঢাকায় ফিরব, আপনারা স্যারকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। এই অবস্থায় উত্তরার 'শীপ ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে' স্যারকে ভর্তি করা হয়। পরের দিন ২৩ আগস্ট বেলা ১১টা নাগাদ ওই হাসপাতালে গিয়ে মাসুম স্যার ও ফরিদ ভাইকে পাই। তখন স্যারের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছিল।

স্যারের কাছে গেলাম। দেখলাম মুখটা শুকনা, ক্লান্তি এবং ঘুমহীনতার ছাপ। আমি সাহস দিয়ে বললাম, স্যার সব ঠিক হয়ে যাবে। ওই দিন স্যারের ঠান্ডা জ্বর, শ্বাসকষ্টের লক্ষণ স্পষ্ট প্রবল ছিল। পরদিন আমি আবার চট্টগ্রামে যাই। আবার একদিন পর ২৫ তারিখে ফিরে আসি। ইতোমধ্যে স্যারকে ওই হাসপাতাল থেকে উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নেওয়া হয় দেখভাল করার সুবিধা এবং আরো ভালো চিকিৎসা পাওয়ার জন্য। আমি ২৭ তারিখ বিকেলে স্যারকে ক্রিসেন্ট হাসপাতালে দেখতে যাই। তখন নেবুলাইজেশনের মাধ্যমে তার শ্বাসনালির সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু পরে স্যারের অবস্থার আরো অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়।

কাজী স্যারের একমাত্র মেয়ে ডা. তাসনিম আসেন আমেরিকা থেকে। পরদিন ২৯ তারিখে কাজী স্যারের ছোট ছেলে আমেরিকা থেকে আসেন। স্যারের অবস্থার আরও অবনতি হতে থাকে। আইসিইউতে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করে স্যারকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। পরদিন ৩০ আগস্ট বিকেল ৪টায় এই প্রবাদপ্রতীম কৃষিবিজ্ঞানীর দীর্ঘ কীর্তিময় জীবনের অবসান হয়। চলে যান না ফেরার দেশে।

আমরা ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা স্যারকে হারিয়েছি। কিন্তু তার মুখাবয়ব, চোখের দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর আমার চৈতন্যে আজও অবিনশ্বর। আমি পরম করুণাময় আল্লাহ তালার কাছে কায়মনে প্রার্থনা করি, আল্লাহপাক যেন তাঁকে বেহেস্ত নসিব করেন।

লেখক : সাবেক মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কাজী বদরুদ্দোজা: কৃষি গবেষণা এবং উন্নয়নের পথিকৃৎ

মনজু আরা বেগম

বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন ও কৃষকের উন্নয়নের কথা বলতে প্রথমেই যার নাম আসে তিনি কৃষি বিজ্ঞান জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা। তিনি বাংলাদেশে উচ্চ ফলনশীল গম এবং ভুট্টা উৎপাদনে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন যা এ দেশের কৃষি ক্ষেত্রে নবদিগন্তর উন্মোচন করে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দেন। এর ফল হিসেবে এদেশের কৃষক উচ্চ ফলনশীল গম, ভূট্টা ও শাকসবজি আবাদ করে খাদ্য ঘাটতি কমাতে সক্ষম হয়েছে। সে কারণেই বাংলাদেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ৯৭ বছর বয়সেও (০১.০১.১৯২৭-৩০.০৮,২০২৩) তিনি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এ দেশের কৃষি ও কৃষিবিজ্ঞানের উন্নয়নে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে গেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন কৃষি গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। কৃষি সেক্টরে কোথায় কি হচ্ছে, কারা কি অবদান রাখছেন, কোথায় কীভাবে আরও উন্নয়ন করা যেতে পারে তা নিয়ে এই বয়সেও তিনি আলোচনা করতেন ও সুচিন্তত মতামত ব্যক্ত করতেন। কৃষির উন্নয়ন ছাড়া তাঁর মাথায় অন্যকিছু ভাবনা খুব কমই আসতে দেখেছি। কৃষি বিষয়ক কোনো অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে হুইল চেয়ারে বসে হলেও সেখানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতেন। এই হচ্ছেন স্বনামধন্য কৃষি বিজ্ঞানী ড.কাজী এম বদরুদ্দোজা।

ড. কাজী বদরুদ্দোজা ৩০শে আগস্ট ২০২৩ তারিখে বার্ধক্যজনিত রোগে (০১.০১.১৯২৭-৩০.০৮,২০২৩) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা হয় ২৫ আগস্ট '২৩ রাজধানীর উত্তরার একটি বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী এবং কৃষিবিজ্ঞানে অনন্য পথিকৃতকে হারাল। ড. বদরুদ্দোজার মৃত্যুর পরে তার শুভানুধ্যায়ীরা তাঁর নামে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করছেন জেনে খুব ভাল লাগছে।

ড.কাজী এম বদরুদ্দোজার মত স্বনামধন্য এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন কৃষি বিজ্ঞানীর সান্নিধ্যে এসে তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য

হয়েছে। প্রথমত তিনি এ দেশের তথা উত্তরবঙ্গের একজন কৃতি সন্তান। তার বাড়ি গাইবান্ধা জেলায়। আমার শ্বশুরবাড়িও গাইবান্ধায়। তিনি আমার শ্বশুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহপাঠী হওয়ায় পারিবারিকভাবে আমাদের পরিচয়, যাতায়াত এবং ঘনিষ্ঠতা থাকায় তাকে চাচা বলে সন্মোধন করতাম। শুধু তাই নয় তিনি যখন পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন তখন আমার সহধর্মী পাকিস্তানে যান লেখাপড়া করার জন্য তাঁর চাকুরিজীবী মামার সাথে। মামা হঠাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানে বদলি হয়ে যান। মামার বদলিজনিত কারণে তাঁর লেখাপড়া যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য আমার শ্বশুর মহোদায় চাচাকে অনুরোধ করেন এবং সেইসাথে তাঁর ছেলেকে সেখানে চাকুরি প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি পরবর্তী সময়ে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৩ সালে দেশে ফিরে পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন, আমার সহধর্মী রওশন এ রহমানও একই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং তাঁর সাথে দীর্ঘসময় চাকুরি করেন। তিনি রওশনকে পুত্রসম স্নেহ করতেন। ১৯৮৪ সালে আমার বিয়ের পর থেকেই আমি চাচার স্নেহ ভালবাসা পেয়ে এসেছি। তাঁর পরিবার পরিজন দেশের বাইরে থাকাতে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এদেশেই পরিবার পরিজনহীন একা নিভৃতে তার উত্তরার বাড়িতে জীবনযাপন করতেন। তাঁর ভাল-মন্দ, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এক কথায় যে কোনো বিষয়ে তিনি আমাদের স্মরণ করতেন। চাচার পছন্দের কোনো খাবার খেতে ইচ্ছে হলে তিনি আমাদের নির্দ্বিধায় ফোন করতেন। মাছের মাথা এবং শীতের পিঠা ছিল চাচার অত্যন্ত পছন্দের খাবার। তিনি বড় মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘন্ট খেতে পছন্দ করতেন। আমি একদিন মাছের মাথা রান্না করে ফোন দিই। চাচা আপনার পছন্দের মাছের মাথা ও ছোট মাছের চচ্চরি রান্না করেছি। আপনি কি আমার বাসায় আসবেন নাকি পাঠিয়ে দিব? তিনি জানতে চাইলেন বাসায় লিফট আছে কিনা? লিফট আছে জেনে আমার বাসায় তিনি আসতে চাইলেন। এটা ২০১১ সালের কথা। উত্তরা থেকে শ্যামলীতে এসে সারাদিন আমাদের সাথেই কাটান। বাসায় তাঁর আসার কথা শুনে ড. এম গুল হোসেন, ড.এ কিউ শেখ এবং ওনার কেয়ার গিভার আশিষ ও আরতি রানী সরকারসহ কৃষিবিদ ওয়াহেদুননবী সরকারও এসেছিলেন। এভাবে তিনি বেশ

কয়েকবার আমাদের বাসায় এসেছেন। আমার ছেলে মেয়েও তাঁকে দাদু বলে ডাকতেন এবং তিনিও তাদের খুব পছন্দ করতেন। গাইবান্ধায় একটি নদীর মাছ পাওয়া যায় যা স্থানীয় ভাষায় "বইরাল মাছ" নামে সুপরিচিত। ছোট মাছ হলেও খুব সুস্বাদু সেইসাথে গাইবান্ধার প্রসিদ্ধ রসমালাই তাঁর অত্যন্ত পছন্দের খাবার। আমরা দেশে গেলে বা কেউ দেশ থেকে ঢাকায় এলেও চাচার জন্য এ দুটো জিনিস রওশন সাহেব নিয়ে আসতেন বা আনানোর ব্যবস্থা করতেন। আমি যত্ন করে রান্না করে টিফিন ক্যারিয়ারে পাঠাতাম। তিনি খুব বেশি খেতেন না। খাওয়া দাওয়া ছিল সীমিত পরিমাণে। খাওয়ার পরে তিনি ফোন করে তার অনুভূতি প্রকাশ করে ধন্যবাদ দিতে ভুলতেন না। আমার শ্বশুর মহোদয় ১৯৮৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। শ্বশুর বেঁচে না থাকায় চাচার কথা খুব বেশি মনে পড়তো। চেষ্টা করতাম তাঁর পছন্দের খাবারটা রান্না করতে। এছাড়াও তিনি আমার লেখাও খুব পছন্দ করতেন। আমার লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হলেই চাচা ফোন করে উচ্ছ্বাস প্রকাশের সাথে সাথে মতামত জানাতেন। আমারও খুব ভাল লাগতো। এসব কারণে তিনি আমাকে পছন্দ করতেন। আমার স্বামী কখনো তার বাসায় একা গেলে তিনি সাথে সাথেই বলতেন, মনজুকে সাথে নিয়ে আসনি কেন ? ওকে রেখে আসবেনা।

ব্যক্তি জীবনেও তিনি অত্যন্ত সদাশয় ও পরোপকারী উদার মনের মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে সাহায্য সহযোগিতা চেয়েছে কিন্তু পায়নি বা তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়নি এমন মানুষের সংখ্যা খুব কমই পাওয়া যাবে। তাঁর সাহায্য সহযোগিতার হাত সব সময় প্রসারিত ছিল। শুধু তাই নয় তিনি একজন দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন। তাঁর লিডারশিপ কোয়ালিটির কারণে তিনি যে সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন সেগুলোর উন্নয়ন ও সফলতাই তা প্রমাণ করে। তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও বহুমুখী প্রতিভার কারণে তিনি সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। তাঁর এই বিরল প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব আমাদের অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার (বাগ) বিগত মার্চ ২০১৩ সালে স্বনামধন্য এই কৃষিবিজ্ঞানীর জীবনী প্রকাশ করে। বইটি বাংলা এবং ইংরেজিতে মুদ্রিত হয়। যাতে এ দেশের বিভিন্ন কৃষি বিজ্ঞানী কৃষকের উন্নয়ন, কৃষিতে তার অবদান, এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ তার চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে লিখেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর জীবনে আরও অনেক সম্মানজনক বিষয় ও সম্মাননা যুক্ত হওয়ায় তিনি

তাঁর এ বইটির ২য় সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে আমাকে আদেশ করেন। তাঁর খুব ইচ্ছা তিনি আমাকে দিয়ে তার বায়োগ্রাফির ২য় সংস্করণটি প্রকাশ করবেন। বলে রাখা ভালো, আমি অর্থনীতি শাস্ত্র নিয়ে পড়ালেখা করেছি। তবে আমি কৃষি গবেষণা, প্রযুক্তি এবং উন্নয়ন বিষয়ে যেহেতু নিয়মিত পড়ালেখা এবং লেখালেখি করি তাই তাঁকে নিয়ে লিখতে আমি উৎসাহিত হই। তার এ আদেশটি হুবহু এখানে তুলে ধরছি। "মা মনজু আরা, তোমার লেখা আমার খুব পছন্দ। তাই তোমাকে আমার বায়োগ্রাফি রিভাইজড করতে আদেশ করছি। সাইজটা একটু ছোট হলে ভালো হয়। তোমার আংকেল, কে এম বি।" এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি আমাকে অনুরোধ করেননি। আদেশ করেছেন। তার এ আদেশ পেয়ে আমি হতচকিত হয়ে যাই। তার মত স্বনামধন্য, বিচক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব আমাকে তার বায়োগ্রাফি রিভাইজড করতে আদেশ করেছেন এটা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের এবং গৌরবেরও বটে। আমি ভাবতে পারিনি তার বায়োগ্রাফি সম্পাদনা করার নির্দেশ তিনি আমাকে দিবেন। বিষয়টি আমার জন্য কঠিন হলেও তাঁকে না বলার মতো আর কোন উপায় ছিল না। সে সময়টি ছিল কোভিড-১৯ নামক এক মহামারির বছর। আমি নিজেও করোনায় আক্রান্ত ছিলাম প্রায় একমাস। এই করোনা মহামারিতে আমি কঠিন একটা সময় পার করেছি। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা আমার উপর দিয়ে যাচ্ছিল। এমন একটা সময়ে তাঁর এই আদেশ আমাকে কিছুটা বিচলিত করলেও আমি তাঁর আদেশ পালন করেছি। আমাকে দিয়ে বইটি প্রকাশ করার কারণ হিসেবে বলা যায়, আমার ভ্রমণ কাহিনি বিষয়ক একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি সেই বইটি পড়েছেন। সেটি পড়ার পরে তাঁর অনুভূতি প্রকাশের জন্য আমাকে ফোন করেন। তাঁর অনুভূতিটি এখানে তুলে ধরছি কারণ আমি সেদিন এত বেশি খুশি ও আনন্দিত হয়েছিলাম যে সে আনন্দটা সবার সাথে শেয়ার করার লোভ সামলাতে পারছি না। তিনি বলেছিলেন "মা তোমার লেখা 'ফেলে আসা দিনগুলি' আমি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে শেষ করলাম। এত ভালো লেগেছে যে, তোমাকে ফোন না করে পারলাম না। আমার জীবনে আমি অনেক বই পড়েছি। কিন্তু এত সুন্দর করে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে এমন প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা বই খুব কমই পড়েছি। আমি তোমাকে একজন বেস্ট লেখকের স্বীকৃতি দিলাম"। আমিতো হতবাক। কি বলছেন তিনি? আমার মত একজন নগণ্য লেখককে তিনি বেস্ট লেখকের স্বীকৃতি দিবেন এটা ভাবতেই আমি

শিহরিত হলাম। শুধু বললাম, চাচা আপনার মত এমন একজন বড় মাপের মানুষ আমাকে বেস্ট লেখকের স্বীকৃতি দিলেন, এটা আমার জীবনে অনেক বড় পাওয়া। আমি আমার এ জীবনে আর কিছু চাইনা। না চাইতেই অনেক বেশি পেয়ে গেছি। এরপর তিনি তাঁর বায়োগ্রাফির অগ্রগতি জানার জন্য প্রায় প্রতিদিনই ফোন করতেন। আমিও চেষ্টা করেছি তিনি সুস্থ থাকতে থাকতেই যেন বইটি তার হাতে তুলে দিতে পারি। এমনি করে বইটির শেষ পর্যায়ে এসে পুরো পাণ্ডুলিপিসহ প্রেসের সম্পাদক এবং ড. বদরুদ্দোজার একজন ভক্ত জনাব সামসুল আলমকে নিয়ে তার উত্তরায় বাসায় যাই। তিনি পাণ্ডুলিপিটি হাতে নিয়ে প্রচ্ছদটি দেখেই উচ্ছ্বসিত হন। বার বার বলেন, মা প্রচ্ছদটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এখানে বলে রাখি বইয়ের প্রচ্ছদটা করেছেন, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এ আমার সহকর্মী জাতীয় পর্যায়ের বিশিষ্ট অঙ্কন শিল্পী জনাব রফিকুল ইসলাম। পাণ্ডুলিপিটি পড়তে কষ্ট হওয়ায় তিনি আমাকে পড়ে শোনাতে বলেন। আমি প্রায় পুরো পাণ্ডুলিপিটি চাচাকে পড়ে শোনাই যাতে করে পরবর্তীতে তিনি বা অন্য কেউ কোন অভিযোগের তীর আমার দিকে না ছোড়েন।

ড. বদরুদ্দোজাকে ১৯৮৫ সালে সরকারিভাবে জাতীয় ইমেরিটাস বিজ্ঞানীর সম্মানে ভূষিত করা হয়। অশীতিপর এ কৃষি বিজ্ঞানী তার জ্ঞান মেধা ও প্রজ্ঞা সবসময় তার পথিকৃৎদের দিয়ে গেছেন। স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে অসুবিধা বোধ করলেও সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন গ্রামবাংলার পথে প্রান্তরে এ দেশের মাটি ও মানুষকে ভালবেসে। এত বড় মাপের একজন মানুষ হয়েও অত্যান্ত সাদামাটা এবং সহজ সরল জীবনযাপন করতেন। তাঁর পরিবার পরিজনেরা সবাই বিদেশের মাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও তিনি বারবার ফিরে এসেছেন এ মাটির টানে। বিদেশের চাকচিক্যময় আয়েশি বর্ণিল জীবন তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। সত্যিকার অর্থেই তিনি একজন প্রকৃত দেশ প্রেমিক। জাতীয় পর্যায়ে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সরকার ২০১২ সালে তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেয়। তিনি শুধু দেশেই নয় দেশের বাইরেও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারে সম্মানিত হন। দেরিতে হলেও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রবীণ এ কৃষি বিজ্ঞানীকে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান করাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। আমাদের দেশে সাধারণত কোন ব্যক্তির

জীবদ্দশায় তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন খুব কমই করা হয়। মরণোত্তর পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদানের রেওয়াজটাই বেশি লক্ষ করা যায়। ড. কাজী বদরুদ্দোজা তাঁর জীবদ্দশায় স্বাধীনতা পুরস্কার পাওয়ায় তাঁর কাছাকাছি এবং স্নেহধন্য আমরা যারা, তাঁর অত্যন্ত কাছের তাঁরা আনন্দিত ও গর্বিত। জাতি তাঁর মত একজন দেশপ্রেমিক কৃষিবিজ্ঞানীর অবদানের কথা স্বীকার করবে কৃতজ্ঞ চিত্তে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাকে জান্নাতের সুউচ্চ আসন দান করেন এবং তার পরিবারকে সুস্থ ও সুন্দর রাখেন।

লেখক : সাবেক মহাব্যবস্থাপক বিসিক ও কলামিস্ট জাতীয় দৈনিক।

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা: শেষ জীবনের অসমাপ্ত স্বপ্ন

ড. আবুল কালাম আযাদ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন শেষে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্যারের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), গাজীপুরে আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল। আমি যখন উক্ত প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করি। তার কিছুদিন আগেই স্যার উক্ত প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চেয়ারম্যান হিসেবে ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে (বিএআরসি) চলে আসেন। ১৯৭৬ সনে উনার উদ্যোগেই বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তিনিই সংস্থা প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। তবে বেশ কিছুকাল তিনি যুগপৎ ভাবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অন্যত্র চলে গেলেও কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের অফিস, ল্যাব বা গবেষণা মাঠের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কথা জানান দিত। প্রতিষ্ঠানের অপরূপ সৌন্দর্য, ল্যাবরেটরিসহ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ও মনোমুগ্ধকর অবকাঠামো, সুবিশাল মাঠ গবেষণা-প্রান্তর এসব কিছুতেই তাঁর সুপরিকল্পনা ও সুরুচির ছাপ ছিল যা আজ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। শুধু তাই নয়, সেসময় তিনি দেশসেরা আন্তর্জাতিক মানের গবেষকদের নিয়োগ দিয়ে গবেষণার মান ও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ধান, গম ও ভুট্টা বাদে অন্য সকল সিরিয়াল ক্রপ, ফল, সবজি, আলু, মসলা-ফসল, ডাল-ফসল, তেল-ফসলসহ প্রায় দুই শতাধিক (২০০) ফসল নিয়ে নানামুখী গবেষণা করে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৭ সনে আলাদা প্রতিষ্ঠান হওয়ার আগ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান গম ও ভুট্টা নিয়েও গবেষণা কাজ করত। এসবের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীতে স্বাধীনতা পদক, একুশে পদকসহ সকল ধরনের পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি শেষে চাকুরি জীবনের একেবারে শেষের দিকে এসে উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিন বছর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলাম।

ড. বদরুদ্দোজা স্যারের আরও একটি সুমহান অবদান হচ্ছে ঢাকার ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য জিনিসের মত কৃষি ব্যবস্থা ও অবকাঠামো যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত, ঠিক সেসময় তিনি কৃষি গবেষণাকে সমন্বয় সাধন করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমাদেরকে বহুবার বলেছেন, ফার্মগেটের যে স্থানে আজ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ভবন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে পাঁচতারা হোটেল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাজী স্যার সরাসরি বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে সে স্থানে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সনে এক সরকারি গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানেও তিনি দেশ সেরা আন্তর্জাতিক মানের গবেষকদের নিয়োগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিলেন। ভালো কাজের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটিও স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হয়েছে। এখানেও আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রায় এগারো বছর কাজ করার এবং দু'বছর নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও তাঁর সাথে সরাসরি কাজ করার সুযোগ হয়েছে তাঁর জীবনের শেষ তিন বছরে যা এই লেখার শেষ অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ড. বদরুদ্দোজা স্যার পাকিস্তান কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। বাংলাদেশে ফিরেই তিনি অনুধাবন করলেন একটি বা দু'টি ফসলের উপর নির্ভর করে কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি শস্য বহুমুখীকরণের উপর জোর দিলেন। তিনি অনেক ঝুঁকি নিয়ে প্রথমবারের মত ভুট্টা ও গম চাষ সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেন। সে সময়ের সফল উদ্যোগের ফলেই ফসল দুটি আজ বাংলাদেশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রধান ফসল।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তিনি কৃষি গবেষণার সাথে কৃষি শিক্ষার সম্পৃক্তকরণে গাজীপুরের সালনায় ইনস্টিটিউট অব পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ইন এগ্রিকালচার (IPSA) স্থাপন করেন যা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও, দিনাজপুর ও ধুমকিতে কৃষি

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত করেন। তাছাড়া বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA), ময়মনসিংহ; বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI), ময়মনসিংহ; বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BLRI), সাভার, ঢাকা প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল।

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্যার তার এক একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, স্বাধীনতার পর তৎকালীন সরকার তাঁকে ডেকে কৃষি প্রধান বাংলাদেশের দ্রুত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বলেন। তিনি কাল বিলম্ব না করে দেশের কৃষি উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। প্রসঙ্গত তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে আরও উল্লেখ করেন যে, ৮০'র দশকে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট তাঁকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হওয়ার জন্যও অফার দিয়েছিলেন। তিনি বিনয়ের সাথে সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্যার তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১২ সালে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব "স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১২" লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে "ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট" পদ দিয়ে সম্মানিত করেন। তাছাড়া জেবুন্নেসা- কাজী মাহবুবউল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট স্যারকে ১৯৮৩ সালে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৯৯ সালে কলসালটেটিভ গ্রুপ অব এগ্রিকালচার রিসার্চ ও বিশ্বব্যাংক স্যারকে ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশেষ সম্বর্ধনা প্রদান করে। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ ১৯৯১ সালে স্যারকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রফেশনাল সোসাইটি বিভিন্ন সময়ে স্যারকে স্বর্ণপদক প্রদান করে। স্বাধীনতাপূর্ব পাকিস্তান সরকার কাজী স্যারকে ১৯৬৮ সালে "তমঘা-ই- ইমতিয়াজ" ও পরবর্তী বছর "তমঘা-ই-পাকিস্তান" খেতাব প্রদান করে।

কাজী স্যার আজ আমাদের মাঝে নেই। প্রায় শতবর্ষের বর্ণাঢ্য জীবন শেষে বিগত ৩০ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে অপরাহ্নে চিরবিদায় নিয়ে আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন। আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর পরামর্শ ও কিছু অপূর্ণ স্বপ্ন। ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষের এমনি দুটি অপূর্ণ স্বপ্নের কথা আপনাদেরকে জানাব। কাজী স্যারের প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার (বাগ) প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় ২৭ বছর যাবৎ জনকল্যাণে এদেশে কাজ করে আসছে। কৃষি ও কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নানা ধরনের

পুরস্কার প্রবর্তন, অ্যাকশন রিসার্চ, সমসাময়িক কৃষি বিষয়ে সরকারকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা বাগের অন্যতম প্রধান কাজ। দেশের অত্যন্ত সিনিয়র পর্যায়ের কৃষি বিশেষজ্ঞ বা প্রফেশনালগণ এর ফেলো (সদস্য) হওয়ার সুযোগ পায়। আমি মহাপরিচালক হিসেবে অবসরের ছয় মাসের মধ্যে বাগ এর ফেলো হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। কাজী স্যার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবিত মাল্টা খেয়ে এতটাই বিমোহিত হয়েছিলেন যে, তিনি এই মাল্টার দ্রুত সম্প্রসারণের তাগিদ দিচ্ছিলেন। এজন্য তিনি বারি'র ফল বিভাগকে তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননায়ও ভূষিত করেছিলেন। আমার অবসরের কিছুদিন পর আমাকে তিনি ফোন করে বলেছিলেন যে, এই মাল্টাসহ আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প তৈরি করে দিতে হবে যা তিনি অর্থায়নের জন্য কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনে পাঠাবেন। আমি এই ছোট্ট প্রকল্পটি তৈরির সময় যতবার স্যারের সাথে মত বিনিময় করেছি ততবারই তিনি কৃষি গবেষণা-কৃষি সম্প্রসারণের মধ্যে লিংকেজ আরও শক্তিশালী করার কথা বলেছেন।

প্রায় শতবছর বয়সের এমন একজন ক্ষণজন্মা মানুষ যিনি তাঁর সারাজীবন কৃষি ও কৃষি গবেষণা নিয়ে কাজ করেছেন, জীবনসায়াহ্নে এসেও তিনি অনুভব করেছেন, কৃষি ছাড়া দেশের টেকসই উন্নয়ন হবে না, এবং কৃষি উন্নয়নের মূল উপজীব্য হচ্ছে কৃষি গবেষণা-কৃষি সম্প্রসারণের লিংকেজ। গবেষণা ও সম্প্রসারণ সম্মিলিতভাবে কাজ না করলে আধুনিক বা উন্নত কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে না। উনি বলতেন, কৃষিপ্রযুক্তি যারা উদ্ভাবন করেছেন, তাদের সহযোগিতায় কৃষিতে কর্মরত মাঠ পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও প্রাগ্রসর চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। আমাদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) এর উদ্যোগ নিতে হবে। কাজী স্যারসহ বাগের সিনিয়র ফেলোদের পরামর্শে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে একাধিক সভা ও কর্মশালায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবটি প্রস্তুত করা হয়েছিল যেখানে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। উক্ত প্রকল্প প্রস্তাবে কৃষির সামগ্রিক বিষয় যেমন ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেই সাথে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন বা কেজিএফ স্পনসর্ড প্রযুক্তিগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। চূড়ান্ত প্রকল্প

প্রস্তাবে ১৭টি প্রযুক্তি প্যাকেজ নিয়ে ৫০ ব্যাচ টিওটি নির্ধারিত হয় যা দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে বা দেশের বিভিন্ন স্থানের তিনটি বড় সম্প্রসারণ এজেন্সি (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর) এর অপেক্ষাকৃত নবীণ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করবেন। কাজী স্যারের এই প্রকল্পটি অনুমোদনে কেজিএফ এর নির্বাহী পরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস ও বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এর আন্তরিক সহায়তার জন্য বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার তাঁদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কাজি স্যার এবং বাগ এর ফেলোগণ আমাকে প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করেন। আমরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তিনজন চৌকস কর্মকর্তাকে অধিদপ্তরের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে পেয়ে যাই। সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান উনাদের মনোনয়ন দেন। আমাদের লক্ষ্য হলো ৫০ ব্যাচ টিওটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৫০০ জন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও প্রাগ্রসর কৃষককে টিওটি প্রদান করা। আমাদের প্রশিক্ষণের মূল বিষয় ছিল কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর বা বিস্তারের মাধ্যমে সম্প্রসারণ এজেন্সি গুলির কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং একইসাথে এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে গবেষণা-সম্প্রসারণ লিংকেজটিও শক্তিশালী করা। উক্ত প্রশিক্ষণ গুলির বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত সময় উপযোগী ও চাহিদা মাফিক। এই প্রশিক্ষণগুলিতে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সেরা প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষক হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন তারা অপেক্ষাকৃত নবীন, বা এ ধরনের প্রশিক্ষণ ইতোপূর্বে পাননি বা খুব কমই পেয়েছেন। প্রশিক্ষণগুলি দেশের বিভিন্নস্থানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বা দেশের বিভিন্নস্থানের তিনটি বড় সম্প্রসারণ এজেন্সি (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর) এর কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করছেন। ক্ষেত্রবিশেষে কিছু বিষয়ে মাঠে নিয়ে গিয়ে হাতে কলমে দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বা সমাপনীতে কাজী স্যার নিজেও অনেক সময় উপস্থিত থাকতেন। এছাড়া, নার্স, বিশ্ববিদ্যালয় ও সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সিনিয়র পর্যায়ের কর্মকর্তাগণও উপস্থিত থাকতেন।

প্রশিক্ষণগুলি মানের দিক থেকে সেরা বলছেন প্রশিক্ষণে অংগ্রহণকারীগণ ও

তিনজন ফোকাল পয়েন্ট যারা প্রশিক্ষণ চলাকালে সর্বক্ষণ আমার পাশেই উপস্থিত ছিলেন। বিগত ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে এমন একটি প্রশিক্ষণ ছিল বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি, সাভারে। লাঞ্চ টাইম গড়িয়ে যাচ্ছে, খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, এক ঘণ্টার সেশন দুই ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে, আমার বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী কেউই প্রশিক্ষণ কক্ষ ছেড়ে যাচ্ছিল না। আমরা এটাকে কী বলব? সফল না বিফল? আবেগে আপ্লুত হয়ে আমার শুধু কাজী স্যারের কথাই মনে হচ্ছিল। আমাদের অধিকাংশ প্রশিক্ষণগুলির মান এমনই ছিল।

কাজী স্যারের শেষ জীবনের আরও একটি স্বপ্ন ছিল আমাদের দেশে ভুট্টা থেকে ভোজ্য তেল উৎপাদন। পশু খাদ্য হিসেবে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পশু খাদ্যের মান অক্ষুণ্ন রেখেও এর ভ্রুণ বা জার্ম অংশ থেকে ভোজ্য তেল উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু এর জন্য প্রচুর গবেষণা দরকার। বর্তমানে বিশ্বের ৫০টির অধিক দেশ বাণিজ্যিকভাবে ভুট্টা থেকে ভোজ্যতেল উৎপাদন করছে। আমাদের দেশেও সরকার ভোজ্যতেল উৎপাদন বৃদ্ধির নানামখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাই ভুট্টা থেকে ভোজ্যতেল উৎপাদন বিষয়ে স্যার নিজে উদ্যোগী হয়ে সরকারের কৃষি বিষয়ে পলিসি মেকার ও সিমিট (CIMMYT) মহাপরিচালকের সাথে পত্রযোগাযোগ করেছেন, অনেকের সাথে কথাও বলেছেন। কাজী স্যার আমাকে দিয়ে বিস্তারিত একটি লেখাও লিখিয়েছিলেন যা গত বছর চারটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাগ, বিএআরসি ও সিমিট, বাংলাদেশের উদ্যোগে এ বিষয়ে বিএআরসিতে একটি কর্মশালারও আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে "ভুট্টা থেকে ভোজ্যতেল উৎপাদনের সম্ভাবনা" বিষয়ে আমার একটি প্রেজেন্টেশনও ছিল। দীর্ঘ প্রায় দুমাস পরিশ্রম করে আমি উক্ত প্রেজেন্টেশনটি তৈরি করেছিলাম। কোন কাজ উপলক্ষ্যে কাজী স্যারের সাথে দেখা হলে কিংবা আমাকে বাসায় প্রায়ই ফোন করে স্যার জানতে চাইতেন ভুট্টার তেলের কী হল? এ বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতি না থাকায় আমি ছোট্ট করে উত্তর দিতাম আপনার এই স্বপ্নও একদিন পূরণ হবে। এখন আমাদের সকলেরই দায়িত্ব স্যারের এই অসম্পূর্ণ স্বপ্নগুলি বাস্তবায়ন করা।

প্রায় শতবছর বয়সেও কাজী স্যারের স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোনো কিছুই তিনি ভুলতেন না। সবকিছুই তাঁর মনে থাকতো। শেষ জীবনেও তিনি কৃষি নিয়ে ভাবতেন, আমাদেরকেও উপদেশ দিতেন। আমি কৃতজ্ঞ কাজী স্যারের প্রতি, বাগ এর প্রতি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি যাঁরা আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন সরাসরি স্যারের সাথে কাজ করার। আমি চারটি প্রতিষ্ঠানের সংস্থা প্রধান হিসেবে কাজ করে অবসর নেয়ার পর স্যারের সাথে কাজ না করলে বুঝতেই পারতাম না যে জীবনের কত জিনিসই অজানা থেকে যাচ্ছে। পরিশেষে আমি কাজী স্যারের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

লেখক : সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

স্মৃতির আয়নায় চির অম্লান
ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা
এম তারিক হাসান

বাংলাদেশের কৃষি গবেষণার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একনিষ্ঠ সাধক, বহুমাত্রিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোক্তা এবং কৃষি উন্নয়নের প্রাণপুরুষ ও আলোকবর্তিকা ইমিরেটাস সায়েন্টিস্ট ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা স্যারের সাথে আমার অতীত জীবনের স্মৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। চাকুরি জীবনের শুরুতেই এ মহান ব্যক্তির সাথে আমার পরিচয়। আমার কর্মকালে যেকোনো উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমের সূচনায় তাঁর সমর্থন, প্রশংসা এবং উৎসাহ আমাকে অনেক অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসার হওয়ার কারণে সরাসরি স্যারের সাথে যোগাযোগ খুব বেশি না হলেও পরোক্ষভাবে যখনই কোন কাজের কথা তিনি শুনতেন তিনি প্রশংসা করতেন। আমিও কৃষি বিষয়ে তাঁর উন্নত চিন্তা, চেতনা ও ধ্যানধারণা অনুসরণে সচেষ্ট থাকতাম। আমার পেশাগত জীবনের শেষ পর্যায়ে ঢাকায় আসার পর স্যারের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বেড়ে যায় এবং প্রায় সময় স্যারের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হতো। এক সময়ে স্যার আমাকে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার এর ফেলো হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। আমি সাথে সাথে ফেলো হওয়ার জন্য উদ্যোগ নিই। পরবর্তীতে যখনই স্যারের সাথে কোন মিটিংয়ে দেখা হতো স্যার আমাকে বলতেন, একাডেমিতে তোমার এ্যাকটিভ রোল থাকা চাই। অর্থাৎ স্যার চাইতেন আমি যেন বাগ এর নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হই। আমরা সকলেই জানতাম উনি শারীরিক সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করে কৃষি ও পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজনে যেখানেই কৃষি বিষয়ক কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেতেন, সেখানেই তিনি চলে যেতেন। তিনি 'কৃষিবিদ গ্রুপ' এর প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজিপাড়া থেকে সাভার বিরুলীয়ার 'কৃষিবিদ সিটি' পর্যন্ত যখনই যেখানে অনুষ্ঠান হয়েছে, স্যার সব অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন।

সারা বিশ্ব যখন করোনা অতিমারিতে আতঙ্কিত ও পর্যদুস্ত, সে সময়েও স্যার সুযোগ পেলেই চলে যেতেন মিটিংয়ে। সেখানে গিয়ে সবার খোঁজ খবর

নিতেন। যদি কাউকে অনেকদিন না দেখতেন, তখন নিজে ফোন করে বা কখনও কেয়ারটেকার আশীষকে দিয়ে টেলিফোন করে আমাদের খোঁজ খবর নিতেন। তাঁর পিতৃসম আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা আমাদের কাছে ছিল অমূল্য সম্পদ। করোনা থেকে নিরাপদ থাকতে স্যার কিছু হোমিও ঔষধ খেতেন। আমাদেরও সে ঔষধ খাওয়ার জন্য উপদেশ দিতেন। করোনায় তিনি নিরাপদ ছিলেন। কিন্তু করোনাকাল উত্তরণের পর এক পর্যায়ে স্যার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি জানতাম স্যারের খবর সব চেয়ে বেশি পাওয়া যাবে ফরিদ সাহেবের কাছে। তাই ফরিদ সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে উনার সার্বিক অবস্থা জানবার চেষ্টা করতাম। প্রায়ই স্যারকে হাসপাতালে দেখতে যেতাম। সর্বশেষ উনাকে দেখতে গেলাম ২০২৩ সালের ২৮শে আগস্ট বিকেলে। তখন স্যার কথা বলার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন, তবে বুঝতে পারতেন কে এসেছে। আমি স্যারের কাছে গেলে স্যার আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করলেন। অনেকক্ষণ ছিলাম। চলে আসার সময় আমি বিদায়ের অনুমতি চাইলে, আবার মাথায় হাত রেখে দোয়া করতে করতে বললেন এবং জানতে চাইলেন, আমি নাস্তা খেয়েছি কি না। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও পিতৃসম অভিভাবক, কৃষি উন্নয়নের মহিরুহ, বটবৃক্ষের ছায়ায় রেখে যখন এমন কথা বলেন, তখন আমার অবস্থা কেমন, তা শুধু অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। আমি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ি। এটা আমার জীবনে আনন্দ-বেদনায় চিরস্মরণীয়, চির অম্লান হয়ে থাকবে।

স্যারের জীবদ্দশায় উনার অনুপ্রেরণায় আমার কর্মময় জীবনের যে সকল সৃজনশীল উদ্যোগে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম তার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ না করলে স্যারের প্রতি আমার শ্রদ্ধাশীল কৃতজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ ছাড়াও, স্যারের দূরদর্শী ও গঠনমূলক উদ্যোগ কৃষি গবেষণার পরিমন্ডলকে ছাড়িয়ে কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনায়ও প্রভাব রেখেছে তা অনেকের কাছে অজানা রয়ে যাবে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কৃষি নির্ভর উন্নয়ন বেগবান করতে উনাকে যে দায়িত্ব প্রদান করেন তার আলোকে তিনি বিভিন্নমুখী কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ভিত্তি গড়ে তোলেন। একই সাথে বঙ্গবন্ধু সূচিত সবুজ বিপ্লব সফল করতে শুধু ধান উৎপাদন ওপরেই জোর দেওয়া যথেষ্ট নয়

তা তিনি অনুধাবন করে গম এবং ভুট্টার গবেষণা জোরদার করে গবেষণা ও সম্প্রসারণের চেতনা ধ্যানধারণা সবার মাঝে সফলভাবে সঞ্চারিত করেছিলেন। স্যারের যে সমস্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - জমি যেন পতিত/খালি পড়ে না থাকে। জমির পর্যাপ্ত ব্যবহার ও উৎপাদনমুখী করতে কৃষকদের কাছে উন্নত প্রযুক্তি, পরামর্শ, সহায়তা এবং কারিগরি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। এর প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে যশোর ক্যান্টনমেন্টের ৫৫ ব্রিগেড অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে ১১০০ একর পতিত জমির মধ্যে ৩৫০ একর জমিতে বিআর-১ (চান্দিনা) আবাদ করে বিপুল সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। যার ফলে দেশে ঐ সময়ে ধানটির সর্বোচ্চ ফলন একর প্রতি ১২০ মন প্রাপ্তির একটি অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধুর "সবুজ বিপ্লব স্বর্ণপদক" অর্জন করেছিল। এই উদ্যোগের সাফল্য তুলে ধরতে সেনানিবাসে আয়োজিত বিশেষ একটি সমাবেশে তদানীন্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সেনাবাহিনী প্রধান, অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ ও ভিআইপি মহোদয়দের উপস্থিতিতে আমি মানপত্র পেশ করেছিলাম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নতুন এই প্রচেষ্টায় যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতিত জমির সর্বোচ্চ সাফল্য উপস্থিত সকলের নিকট অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল। পরবর্তীতে দেশের অন্যান্য সেনা-নৌ-বিমান বাহিনীর পতিত জমিতে অনুরূপ ব্যবহার শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়।

স্যারের আরেকটি উদ্যোগ ছিল দেশী ফলের গবেষণা, উন্নয়ন এবং ব্যাপক প্রসার। অপরদিকে তিনি পরিবেশ দূষণরোধ এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন নিরসনে বৃক্ষের বলিষ্ঠ অবদান চিহ্নিত করে ব্যাপক বৃক্ষায়নের সুপারিশ করেন। এর আলোকে পরিবেশ উন্নয়নে বৃক্ষের গুরুত্ব ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ফল গাছের চারা পুরস্কার হিসেবে বিতরণের নতুন এক উদ্যোগ সূচনা করি। এই কার্যক্রমে খুলনা জেলা পরিষদের অর্থায়নে নয়টি উপজেলার ৯২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাক্রমে ১৯৯১ সালে ১৮,০০০ এবং ১৯৯২ সালে ২২,০০০ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কাজী পেয়ারা, আম, লেবু, নারিকেল, ইত্যাদির চারা পুরস্কার হিসেবে বিতরণ করে পরিবেশ সচেতনায় এক আলোড়ন হয়েছিল। পরবর্তীতে দেশব্যাপী নানাবিধ কার্যক্রমে ফল গাছের চারাকে পুরস্কার এবং সম্মানী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলে জানা যায়।

প্রযুক্তির প্রসারে স্যারের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। এর আলোকে আমার উদ্যোগও তদরূপ ছিল। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবিত গ্রীষ্মকালীন মুগ ডাল অবমুক্তির অপেক্ষায় থাকলেও ঈশ্বরদী আঞ্চলিক কৃষি গবেষণাগার ড. আশরাফ এর কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া জেলায় ১৯৮২ সালে কৃষক পর্যায়ে প্রদর্শনী শুরু করি। মাঠ পরিদর্শনে এসে তদানীন্তন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ খান এর সাফল্য দেখে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে কুষ্টিয়া জেলাতে সর্বাগ্রে এই ফসলটি প্রসার লাভ করে।

কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে স্যার সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। স্যার মনে করতেন কৃষি সম্প্রসারণ, উপকরণ সরবরাহ, গবেষণা এবং আর্থিক সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সহযোগিতার অভাবই হল কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের সব চেয়ে বড় অন্তরায়। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এসমস্যা উত্তরণে দাতা সংস্থা IFAD-GTZ (ইফাদ-জিটিজেড) এর আর্থিক সহায়তায় দারিদ্র্য বিমোচন তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প পরিচালনা করে একাধিক সংস্থার সমন্বিত প্রয়াস এর মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হওয়া। কুড়িগ্রাম জেলাতে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, এনজিও-আরডিআরএস, আর্থিক সংস্থা সোনালী ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংকসহ গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন এর সক্রিয় অংশগ্রহণ, সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিপুল সাফল্য এনে দেয়া। এর ফলে ১৯৯৯ সালে জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি প্রণয়নের মূল উপাদান সমূহের সংযোজন হয়। যার মধ্যে অন্যতম হল কৃষক দলভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ সেবা, সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবা, সকল কৃষকদলের জন্য লাগসই প্রযুক্তি সেবক, কৃষক এবং সরকারি, বেসরকারি, এনজিও এবং ব্যাংক সমূহের দ্বারা সমন্বিত কৃষক সেবা সর্বোপরি বটম আপ প্ল্যানিং প্রণয়ন।

পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও আর্থিক উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা অনেক বলিষ্ঠ বলে স্যারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই একই সময়ে খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার ১০০ জন গৃহিণীর বসতবাড়ির আঙ্গিনায় এক শতক জমির 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সবজি উৎপাদন

মডেল' এর প্রশিক্ষণ দিয়ে "সবজি পল্লী" গড়ে তোলা হয়েছিল। বছর শেষে উৎপাদিত সবজি নিজেদের খাওয়া, বিতরণ ও বিক্রয় করে অধিকাংশ গৃহিণীদের ব্যাংকে ১৪০০ টাকা সঞ্চয় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

পরিবেশ দূষণমুক্ত রেখে কৃষিকাজ বেগবান করতে জৈব কৃষিতে স্যারের অপরিসীম আগ্রহ ছিল। এর আলোকে নিম গাছের পাতা এবং বাকলা দিয়ে জৈব বালাইনাশক প্রস্তুত করে BRRI (ব্রি) এর সম্প্রসারণ কর্মশালায় উপস্থাপন করেছিলাম। যার সাফল্য পরে মাঠ পর্যায়ে প্রমাণিত হয়েছিল। মাটির পুষ্টি ও উৎকর্ষতা বজায় রাখতে বসতবাড়িতে "সুপার কম্পোস্ট" তৈরির পদ্ধতি হিসেবে পশুর রক্ত, কলার পাতা-খোল, ঢেঁকি শাক, গোবর, কচুরিপানা, তামাকবর্জ, ইত্যাদি দিয়ে একটি জৈব সার উৎপাদন করেছিলাম, যা মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উপযোগী প্রমাণিত হয়েছিল। তৎকালীন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এভাবে জৈবসার প্রস্তুত করার পদ্ধতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে কৃষক পর্যায়ে এটি বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন শুরু হয়ে যায়।

স্যারের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় ছিল গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সঠিকভাবে পৌঁছানো এবং প্রয়োগ তত্ত্বাবধান করা। সে সময়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠকর্মীদের কর্মস্থলে উপস্থিতির বিষয়ে অনেক অভিযোগ পাওয়া যেত। এমনকি বিষয়টি জাতীয় সংসদেও আলোচনা হয়েছিল। তাই এ সমস্যা নিরসনে ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিভাগের সকল উপজেলায় "কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র" চালু করি, যা সপ্তাহের একদিন কৃষি উপকরণ বিক্রয় দোকানে ব্লক সুপারভাইজারগণ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপস্থিত থেকে কৃষকদের সাথে প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা ও সমস্যা চিহ্নিত করতেন। এই ব্যবস্থাপনা তৎকালীন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। ফলে দেশের প্রতি ইউনিয়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে এ ব্যবস্থা কাজের নিয়মিত অংশ হিসেবে চালু হয়েছে।

ড. বদরুদ্দোজা স্যার বলতেন কৃষি উন্নয়ন অর্থবহ ও বেগবান করতে হলে শুধু দুই একটি ফসল দ্বারা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বহুমাত্রিক ফসল উৎপাদন এবং কৃষক কর্তৃক পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি। তাই তাঁর দূরদর্শী ও

সুদূরপ্রসারী চিন্তাপ্রসূত পরামর্শে নানাবিধ কৃষি পণ্যের উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণকে প্রাধান্য দিয়ে কুড়িগ্রাম জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্প সাফল্যের আলোকে ও অনুরূপ ধারাবাহিকতায় এডিবি এর অর্থায়নে দেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর Northwest Crop Diversification Project নামক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের অংশীজন ছিল কৃষি গবেষণা, ব্রাক, প্রশিকা, গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন, আরডিআরএস, এলজিইডি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ৬১ উপজেলায় সফলতার সাথে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে ফসলের নিবিড়তা ১৭৫% থেকে ২২৩% উন্নীত হওয়া, ৬৭% কৃষক উচ্চ মূল্য ফসল চাষে নিয়োজিত হয়ে সবজি চাষ ৫২% বৃদ্ধি হওয়া,ফল চাষ ১৫%, মশলার চাষ ১৬% এবং অন্যান্য ফসল ১৭% বৃদ্ধি করে নিজেরাই গ্রুপ করে পণ্য বাজারজাত করা। প্রকল্পের আরও বিশেষত্ব হল ৫৩% মহিলাদের অংশগ্রহণ। এর ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষক পরিবারের মধ্যে যে আর্থসামাজিক উন্নয়নের ধারা সূচনা হয়েছিল তার সুদূর প্রসারী প্রভাব এখনও বয়ে চলছে।

স্যারের সর্বশেষ ইচ্ছা ছিল সকল কৃষিবিদ পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য একটি কৃষিবিদ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা। 'কৃষিবিদ গ্রুপ' এর উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ এবং গ্রুপের বার্ষিক সাধারণ সভায় স্যার এই প্রস্তাব পেশ করেন এবং সভায় এ প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ায় সাভার 'কৃষিবিদ সিটি' চত্বরে স্যার নিজেই এ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এটি চালু হবে, ইনশাআল্লাহ।

স্যার আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে, কিন্তু তাঁর অদৃশ্য উপস্থিতি আমাদের সকলকে প্রেরণা যোগাবে অনাদিকাল ধরে, তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সচেষ্ট থাকলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীন উনাকে জান্নাত নসিব করুন। আমিন।

লেখক : প্রাক্তন মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট
ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্মরণে

মোহাম্মদ মাসুম[১]
ফরিদ উদ্দিন আহমেদ[২]

কৃষিতে স্নাতক পাশ করার পর কিছুদিন চাকুরি করার পর নিজে কিছু করার লক্ষ্যে বীজ ব্যবসা শুরু করলাম। লাভ লোকসানের কথা ভাবিনি। শুধু মনে হতো, আমার উন্নত বীজ বাংলার গরীব মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে। এ ব্যবসায় খুব লাভ না হলেও যা আয় হবে তা দিয়ে আমি আমার পরিবার নিয়ে চলে যেতে পারবো।

শুরু করলাম সুরভি সিড কোম্পানি। এ সেক্টরে তখনও খুব বেশি প্রতিযোগিতা নেই। চ্যালেঞ্জ ছিল কৃষকদের মাঝে তথ্য ও প্রযুক্তি পৌঁছে দেয়া। ছোট আকারেই শুরু করলাম কয়েকজন সহযোগী নিয়ে। খুব বেশি বেতনও দিতে পারতাম না। তবে যারা আমার সাথে কাজ শুরু করলো তাদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা আমাদের ধীরে ধীরে সফলতা এনে দিতে সহায়ক হলো। আমরাও বড় হচ্ছিলাম। সাথে নতুন নতুন কোম্পানি জন্ম নিচ্ছে। কেউ দেশে উন্নত বীজ তৈরি করছে, কেউ বা উন্নত বীজ আমদানি করছে। আমি একধাপ এগিয়ে হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানি ও বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নিলাম। মূলত আমরা বীজ ব্যবসায়ীরা হয়ে গেলাম বিএডিসি এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

আমি থাকি উত্তরায়। উত্তরাতে রয়েছে কয়েকশ কৃষিবিদ পরিবার। সবাই মিলে তৈরি করলো উত্তরা কৃষিবিদ সমিতি। আমিও সদস্য হলাম। এ সমিতির সভাপতি হলেন ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত কৃষি বিজ্ঞানী ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা। আমাকেও একটি নির্বাহী পদে নেয়া হলো। কাজেই কাজী স্যারের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটি বড় সুযোগ আমি পেলাম। হাইব্রিড ধান নিয়ে তাঁর আগ্রহ রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে আমি আগে থেকেই জানতাম। এও জানতাম তিনি খুব রাশভারী ব্যক্তি। সব সময় বড় বড় বিজ্ঞজনদের নিয়েই উনার উঠা বসা। আমি তাঁর কত কাছে যেতে

পারবো, এমন একটি শঙ্কা কাজ করছিল। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে দিয়ে তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। আমি একদিন তাঁকে আমার বাসায় নিয়ে আসলাম। ভাবলাম স্যারের সাথে পরিবার নেই। তাই আমার পরিবারের কাছে আসলে ভালো লাগবে। স্যার আসলেন। সামান্য আপ্যায়ন করলাম। বাসার সকলের সাথে আলাপ করিয়ে দিলাম। আমার স্ত্রী, নাতি, ছেলে মেয়ে সবাই যেন তাদের আপনজন পেয়ে গেল। স্যার এক এক করে সবার নাম জানতে চাইলেন। সবাই নাম বললো। স্যার চলে যাওয়ার পর যতবার ফোন দিলেন এক একজনের নাম ধরে কে কেমন আছে জানতে চাইতেন। এমন কি, আমার স্ত্রীর নামও ভুলেন নি। আমার স্ত্রীর নাম ধরে জানতে চাইতেন সে কেমন আছে। এ এক অদ্ভুত স্মরণ শক্তির বিশাল ব্যক্তিত্ব। তখন উনার বয়স প্রায় ৮৫ বছর পার হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই স্যারকে বাসা থেকে নিয়ে আসতাম। আমার স্ত্রী, আমার কন্যা ও তার সন্তান সবার প্রিয় হয়ে গেলেন স্যার। যে মানুষটাকে অনেক কঠিন বলে জেনেছি এখন দেখছি উনি যেন নারিকেল। বাইরে শক্ত, ভিতরে নরম।

আমার ছেলে মেয়ের সাথে স্যারের যেমন সখ্যতা গড়ে উঠলো, তেমনি স্যারের ছেলে মেয়ের সাথে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলো কিছুদিনের মধ্যে। স্যারের জন্মদিন পালনে কিছু আপনজনের মধ্যে আমার পরিবারের সকলেই অন্তর্ভুক্ত হলো। দুই পরিবার মিলে যেন এক পরিবার হয়ে গেলো।

এরমধ্যে একদিন স্যার বললেন, তোমাকে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার এর সদস্য হতে হবে এবং তোমার ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির সামান্য কিছু অনুদান একাডেমিকে দিতে হবে। আমরা এ টাকা কৃষক ও বিজ্ঞানীদের ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কার দেয়ার জন্য ব্যবহার করি। আমি স্যারের এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করি। আমি একাডেমির ফেলো হলাম এবং স্যারের এই মহান কাজে সম্পৃক্ত হলাম। স্যার আমার ব্যবসাকে কল্যাণমূলক কাজ হিসেবে দেখতেন। আরও উন্নতির জন্য নানা ধরনের পরামর্শ দিতেন। আমাদের বাগানের কীটনাশকমুক্ত ফল বিশেষ করে আম স্যারের জন্য নিয়ে আসতাম। স্যার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। পাখির মতো পরিমাণে খেতেন

বটে। নিশ্চিত হতেন সবজি বা ফলের উৎস কোথায়, কোন কীটনাশক আছে কি না। বাজারের পেঁপে খেতেন না। যদি বলতাম আমাদের বাগান থেকে আনা, তবেই রাখতেন। তাঁর কোনো চাহিদা ছিল না। খুবই সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। বাসায় গেলে বেশির ভাগ সময়েই দেখতাম সোফায় শুয়ে আছেন। স্যারের বাসায় গেলে চা ও চায়ের সাথে কখনও একটি সন্দেশ বা কখনও একটি বিস্কুট দিতেন। নিজেও তাই খেতেন। তাঁর সাধারণ জীবন যাপন অন্যদের সাধারণ হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়।

স্যারের ছেলে মেয়েরা প্রতি বছর একবার দেশে আসেন। দেশে আসলে সবাই আমার বাসায় আসে। আমার মেয়ে ও নাতির সাথে গল্প করে, এমনকি স্যারের নাতি অনেক সময় আমার নাতির সাথে আমাদের বাসায়ও ঘুমায়। এমনই এক বন্ধন তৈরি হয়েছিল আমাদের পরিবারের সাথে স্যারের পরিবারের। স্যারের সুখ দুঃখে সব সময় পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। একবার স্যারের কঠিন নিউমোনিয়া হলো। উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে এনে কয়েকদিন রেখে চিকিৎসা করানো হয়েছে।

একাডেমির ফেলো এবং স্যারের সাথে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা আমাকে আরও কয়েকজন মানুষের কাছে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর প্রাক্তন মহাপরিচালক হামিদুর রহমান সাহেব, ড. গুল হোসেন সাহেব, ফরেস্ট্রির ফরিদ উদ্দিন আহমেদ সাহেব, কৃষি গবেষণার ড . আইভি, ড. সেলিনা এরকম আরও কয়েকজন। স্যারের বাসায় অসুস্থতার সময়ে দুই জন মানুষকে অনেকটা সার্বক্ষণিক দেখতাম। এর মধ্যে একজন হলো ফরিদ সাহেব, অন্যজন হামিদুর রহমান সাহেব।

আগস্ট ২০২৩ মাসে স্যার যখন অসুস্থ হলেন তখন আমি প্রায়ই গিয়ে খোঁজ নিতাম। একদিন দুপুর বেলা ফরিদ সাহেব ফোন দিয়ে বললেন স্যারের শরীরটা বেশি খারাপ মনে হচ্ছে। হাসপাতালে নিতে হবে। আপনি কি একটু আসবেন? আমি বললাম, গতরাতে আমি গিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছে উনার ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়ার দিকে গেছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি আসছি। আমার অফিস থেকে স্যারের বাসায় আসতে পাঁচ দশ মিনিট সময় লাগে। আমি গেলাম। ফরিদ সাহেব আর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম স্যারকে

নেবুলাইজ করাতে হবে। ক্রিসেন্ট হাসপাতাল থেকে নেবুলাইজারসহ থেকে একজন নার্স নিয়ে আসলাম। নেবুলাইজ করা হলো। মনে হলো একটু উন্নতি হয়েছে। সন্ধ্যায় আবার ফরিদ সাহেবসহ গেলাম স্যারের বাসায়। আবার নেবুলাইজ করা হলো। মনে হলো তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। তখন আমরা দুজনে স্যারকে নিয়ে শিপ হাসপাতালে চলে গেলাম। অন্য কোথাও সিট পেলাম না কারণ চারিদিকে তখন ডেঙ্গু রোগী। হাসপাতালে কোনো সিট খালি নেই। শিপ হাসপাতালে আমার এক পরিচিত আছে। উনাকে ফোন দিলাম। উনি বললেন, সিট থাকুক আর না থাকুক, নিয়ে আসেন ইমার্জেন্সিতে। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমরা নিয়ে গেলাম। হামিদ সাহেবকে জানবো বলে কল দিলাম। উনি বললেন, উনি মেহেরপুরে দুয়েক দিনের মধ্যেই চলে আসবেন। উনি হাসপাতালের একজনকে চিনেন। উনি যার নাম বললেন তিনি আমারও পরিচিত এবং আমি আগেই উনার সাথে যোগাযোগ করে স্যারকে এখানে নিয়ে আসলাম।

স্যারের ছেলে মেয়ে দুজনেই আমেরিকার বড় ডাক্তার। বড় ছেলে Gastrointestine বিশেষজ্ঞ আর মেয়ে ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। দুজনেরই দুটি নার্সিং হোম আছে। মেয়ে ডাক্তার তাসনিম স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন এর অধ্যাপক। উনার স্বামী একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ।

আমরা স্যারকে ভর্তি করার আগে স্যারের ছেলে মেয়েকে স্যারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত করেছিলাম। তাঁদের সম্মতিতেই স্যারকে হাসপাতালে ভর্তি করালাম। প্রথমে ইমার্জেন্সিতে। এরপর ছেলে মেয়ের পরামর্শ মোতাবেক কেবিনে। উনার খুব কাশি হয়ে বুকে চাপ বোধ করছিলেন। বলা যায় congestion বোধ হচ্ছিল। ডাক্তার দেখে সব টেস্ট করে ফেললেন। বলা হলো হার্টে সামান্য সমস্যা আছে। বুকে কফ আছে। নিউমোনিয়া হতে পারে। উনাকে ভর্তি করে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হলো। অবশ্য ইমারজেন্সি ডাক্তার উনাকে আইসিইউতে দিতে চেয়েছিলেন। আমরা রাজি হই নি। কারণ উনাকে খাওয়ানোর বিশেষ একটি কায়দা আছে যা শুধু উনার দুই সহকারী জানেন। আইসিইউতে গেলে উনার খাওয়ার অসুবিধা হবে। তাছাড়া এদেশে আইসিইউ মানে হলো রোগীর সাথে রোগীর আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক শেষ।

তাঁকে কেবিনেই রাখা হলো। পরদিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অনেক টেস্ট রিপোট দেখে বললেন উনার অনেক সমস্যা। হার্টের সমস্যা, ফুসফুসে সমস্যা, স্মৃতিশক্তির সমস্যা, সর্বোপরি উনার পারকিন্সন রোগ আছে। সে মোতাবেক চিকিৎসা চলছে। উনার কথা শুনে আমরা আবার সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে গেলাম। আমরা ডাক্তার সাহেবকে অনুরোধ করলাম উনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা উনাকে রোগীর মেয়ের সাথে একটু কথা বলিয়ে দিতে চাই যাতে মেয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে। আমরা বললাম উনার মেয়ে একজন চিকিৎসক, আমেরিকায় থাকেন। ডাক্তার সাহেব রাজি হলেন এবং স্যারের স্বাস্থ্য অবস্থার একটি ব্রিফ দিলেন। স্যারের মেয়ে ডা. তাসনিম সব শুনে বললেন, আপনি কি তাঁকে পার্কিনসন্স ও ডিমেনশিয়ার রোগী হিসেবে ডায়াগনোসিস করেছেন? তিনি বললেন, না আমি করিনি। আমাদের নিউরোলজিস্ট করেছেন। মেয়ে বললেন, আমিও একজন ডাক্তার। আমার বাবাকে আমি সব সময়েই দেখাশুনা করি। উনার এ দুটি রোগ নাই। এ রোগের জন্য যে ওষুধ দিচ্ছেন, দয়া করে বন্ধ করে দিন। এরপর বললেন হার্টের সমস্যা বলছেন কেন। বললেন ইসিজি দেখে কার্ডিওলজিস্ট বলেছেন। মেয়ে বললেন আমার স্বামী একজন কার্ডিওলজিস্ট। আমি আর উনি মিলে সব রিপোর্ট দেখে আপনাকে বলতে চাই উনার হার্টে কোন সমস্যা নাই। হার্টের সব ওষুধ বন্ধ করে দিন। আমার অনুরোধ আপনারা শুধু ফুসফুসের সমস্যার চিকিৎসা দেন। মেয়ে হউক ডাক্তার, তবুও মেয়ের এসব ইন্টারফিয়ারেন্স উনার একদম পছন্দ হয় নি। আমাদের দেশে ডাক্তার সাহেবেরা করো কোন পরামর্শ পছন্দ করেন না, তা তাসনিম বুঝতে পারে নি। বাবার চিকিৎসার এমন বেহাল অবস্থা দেখে মেয়ে ডা. তাসনিম সে মুহূর্তেই টিকেট কেটে দেশে যাত্রা শুরু করেন। আমরা স্যারের ছেলেকেও স্যারের অবস্থা জানলাম। আমরা এবার পড়লাম বিপদে। শিপ হাসপাতালের ডাক্তারগণ আমাদের জানিয়ে দিলেন উনারা বিদেশ থেকে কেউ ফোন করলে আর ফোন ধরবেন না। ছেলে ডা. সনি কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তার সাহেব ধরেন নি। এ অবস্থায় আমরা কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এ অবস্থায় এ হাসপাতালে রাখা নিরাপদ মনে হলো না। আমেরিকা থেকে মেয়ে ডা. তাসনিম আসলে ভুল বুঝাবুঝি আরও বাড়তে পারে। তাই আমরা রোগী নিয়ে উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে চলে আসলাম।

যদিও আমরা শিপ হাসপাতাল ছেড়ে আসলাম আমরা বলবো শিপ হাসপাতাল ভালো একটি হাসপাতাল। হাসপাতালের মান বিচার করতে হলে নার্সের সেবার মান একটি বড় নিয়ামক। সে হাসপাতালের নার্স ভালো সেবা দিয়েছেন। সেখানে সিকিউরিটি গার্ডদের ব্যবহারও খুবই প্রফেশনাল। রুম শুধু পরিষ্কার বললে হবেনা, রুমের সাইজ অনেক বড়। কোথাও কোনো ধুলাবালি নেই। সব যন্ত্রপাতি, খাট বা সোফা অসাধারণ সুন্দর। এক কথায় খুব ভালো।

উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর প্রথমে উনাকে কেবিনে রাখা হলো। এর মধ্যে স্যারের মেয়ে ডা. তাসনিম আমেরিকা থেকে চলে এসেছে। আমরা কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছিলাম উনাকে দেখে। উনিই ডাক্তারের সাথে আলাপ আলোচনা করে ট্রিটমেন্ট শিডিউল সেট করলেন। ডাক্তার সাহেবরা খুব যত্নসহকারে উনার পরামর্শ শুনছিলেন এবং সেভাবেই চিকিৎসা চলছিল। এদিকে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। টেস্ট এর পর টেস্ট চলছে। রক্ত, ইকো, এক্সরে কতকিছু। ডাক্তার তাসনিম প্রশ্ন করেই যাচ্ছিল - এ টেস্ট থেকে আপনারা কী পেতে চাচ্ছেন? সে টেস্ট এর ব্যাপারে খুব আপত্তি করছিল তা নয়। বরং বুঝতে চেষ্টা করছিল আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রোগীর সেবাদান পদ্ধতি ও মেডিসিন কি দেয়া হয়। সে নিজেই তার বাবার জন্য ব্যাগে করে কিছু ঔষধ নিয়ে এসেছে। জেনেরিক নাম দেখে সে দেবে ভেবেছিল। কিন্তু পরে ভাবলো ওর বাবা বাসায় গেলে অন্যান্য বারের মতো এসব ঔষধ খাওয়াবে।

এ হাসপাতালের ডাক্তারদের সহযোগিতা পেলেও নার্সদের অদক্ষতায় সে কিছুটা হতাশ ছিল। নার্স স্যারকে সাকশন পাম্প দিয়ে কফ বের করতে গিয়ে ঠিক মতো পারতো না। তাসনিম ঠিক করে দিত। শিখিয়ে দিতো কীভাবে করতে হয়। এনজি টিউব কীভাবে লাগাতে হয়, কেমন করে খাওয়াতে হয় তা শিখিয়ে দিতো। জুনিয়র ডাক্তারদেরও পরামর্শ দিতো, অনেকটা শিক্ষকের মতো করে। সবাই উনার উপস্থিতি খুব এনজয় করতে লাগলো।

বিপত্তি ঘটলো যখন রোগীকে আইসিইউতে নেয়া হলো। ডা. তাসনিম স্ট্যানফোর্ডের মেডিসিনের অধ্যাপক হলেও তার বাবার সাথে ভিজিটিং

আওয়ার এর আগে বা পড়ে দেখা করার অনুমতি নাই। যারা ইতিমধ্যে তাকে জেনেছে, তারা আইসিইউ এর ডাক্তার না। কাজেই ডা. তাসনিম আমাদের মত পাবলিক হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভিজিটিং আওয়ার শুরু হলে উনি ঢুকলেন। হাসপাতালের আইসিইউতে ঢুকার সময় উনাকে ফার্মেসি থেকে অ্যাপ্রোন কিনে ভিতরে যেতে হলো। সে তার বাবাকে দেখে হতাশ হয়ে গেল। তার মনে হয়েছে ব্যবস্থাপনা ঠিক হচ্ছে না। তাই সে ডাক্তারের সাথে কথা বলতে নার্সের মাধ্যমে একজন ডাক্তারকে আনার অনুরোধ করলো। ডাক্তার সাহেব আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আইসিইউ এর ডাক্তার? বললেন হ্যাঁ। ডাক্তার তাসনিম জানতে চাইলেন, আপনার অ্যাপ্রোন কোথায়? বুঝেন ঠেলা! ডাক্তার সাহেবকে এমন প্রশ্ন করা, ডাক্তার সাহেবের মোটেই পছন্দ হলো না। উনি বললেন, অ্যাপ্রোন ভিজিটরদের লাগে। কারণ ওরা বাইরে থেকে জার্ম নিয়ে আসে। আমাদের লাগেনা। এ উত্তর আমাদের মত আমজনতার পছন্দ হবে, কিন্তু আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের পছন্দ হবে না। সে আর বেশি বাড়াবাড়ি না করে ট্রিটমেন্ট প্রটোকল নিয়ে আলাপ করতে লাগলো। অভিযোগের চাইতে তার আগ্রহ ছিল ডাক্তারদের সাহায্য করা। উনি কিছু পরামর্শ দিয়ে বেরিয়ে আসলেন। এরপর উনি ভিজিটিং আওয়ার এর বাইরে যতবারই ঢুকতে চেষ্টা করেছেন, উনাকে কদাচিৎ ঢুকতে দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে নার্সরা উনাকে দেখা মাত্রই আইসিইউতে ঢুকার দরজা বন্ধ করে দিতেন। কখনও দুই একবার ঢুকতে পেরেছে। বেরিয়ে এসে প্রতিবারই তার মন্তব্য ছিল, ব্যবস্থাপনা দুর্বল। এ ওষুধ দেয়া উচিত নয়, ওই ওষুধ দেয়া উচিত। ফিডিং টিউব এভাবে লাগাতে হবে, ইত্যাদি। যে দেশে যে নিয়ম, তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। খারাপ লাগলো তার একটি মন্তব্য শুনে। আসলে আইসিইউতে ওকে যেতে দিচ্ছে না কারণ সে ভুলগুলো ধরিয়ে দিচ্ছে বলে। আসলে এভাবেই আমাদের দেশে আইসিইউ চলে। রোগী আপনার নাগালের বাইরে। নার্স বা ডাক্তাররা কীভাবে রোগীকে সেবা দিচ্ছে আপনি জানতে পারবেন না। রোগী কীভাবে মারা গেলো তার কোন বিশ্লেষণ বা মনিটরিং নাই। আমাদের দেশে সে ধরনের জবাবদিহিতা নেই। এটি শুধু জবাবদিহিতার বিষয় নয়। যে ভুল একটা রোগীর সাথে হয়েছে সেই ভুল আরেকজনে ক্ষেত্রে যেন না হয়, সে জন্য এ পদ্ধতি থাকলে ভালো হতো।

এর মধ্যে আমেরিকা থেকে ছেলেও এসে পড়েছে। আগেই বলেছি ছেলেও ডাক্তার। স্যারের অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। সনি কিছুটা ভেঙে পড়েছে। স্যারকে লাইফ সাপোর্ট দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। মেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, বাবার ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। কাজেই লাইফ সাপোর্ট না দিলেই ভালো। কিন্তু সনি কিছুতেই তার বাবা চলে যাচ্ছে তা মানতে পারছে না। সে চায় তার বাবাকে লাইফ সাপোর্ট দেয়া হউক। সনির কথা মোতাবেক স্যারকে লাইফ সাপোর্টে নেয়া হলো। আইসিইউ থেকে ডাক্তার রোগীর ছেলে মেয়েকে ডাকলেন। দুজনেই আইসিইউতে ঢুকলেন। লাইফ সাপোর্ট দেয়ার জন্য Fentanyl নামক একটি ইনজেকশন দিচ্ছিলেন। সনি যখন দেখলো তার বাবাকে এ ইনজেকশন এর ডোজ যা দেয়া হচ্ছে তা প্রয়োজনীয় মাত্রার অনেক বেশি। সে বলল এত বেশি দিলে রোগী এক্ষুণি মারা যাবে। ডিউটি ডাক্তার বললেন আমরা সব সময় এমন ডোজ রোগীকে দিচ্ছি। আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ডিউটি ডাক্তার দিলেন। দেয়ার সাথে সাথে রোগী মারা গেলেন।

সনি হতবাক হয়ে মৃতদেহের পাশে বসে রইলো। অনেকক্ষণ কোন কথা বলে নি। তার বাবার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে ছিল। আমরা সনিকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। সে একটি শব্দও উচ্চারণ করলো না। বাবার মৃত দেহের পাশে বসে শুধু চোখের জল ফেলছিল। সে বললো আমি জানি পৃথিবীর সব দেশেই চিকিৎসায় ভুল হয়। উন্নত দেশে ভুল নির্ণয় করে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে জানতে হয়। ডাক্তারদের দায় নিতে হয়। ভুল থেকে ওরা শিক্ষা নেয় যাতে অন্য একজন রোগী এমন ভুলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

স্যার আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। স্যারকে নিয়ে উত্তরা ৫ নম্বর সেক্টরে স্যারের অসিহত মোতাবেক উনার দানে তৈরি করা লাশ ধোয়ার ঘরে গোসল দেয়া হলো। তিন নম্বর সেক্টরের মসজিদে জানাজা হলো। পরদিন সকালে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে স্যারের গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হলো।

আমরা হারালাম এক অভিভাবক। আমার পরিবারের সদস্যরা হারালো তাদের প্রিয় চাচা ও নানাকে। তবে তাঁর ছেলে মেয়েরা আমাদের সাথে এমন ভাবে মিশে আছে যেন আমরা যুগ যুগ ধরে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়। স্যারের আত্মার চির শান্তির জন্য প্রাণভরে দোয়া করি।

লেখক : [১]চেয়ারম্যান, সুরভি সীড কোম্পানি
[২]সাবেক সদস্য পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল,
সাবেক নির্বাহী পরিচালক, আরণ্যক ফাউন্ডেশন

Paying homage to Kazi M. Badruddoza

Indrajit Roy

The history of Bangladesh's agricultural research is deeply intertwined with Dr. Kazi M. Badruddoza. At the dawn of independence, the Government of Bangladesh faced numerous urgent tasks in the agriculture sector, particularly increasing domestic food production and overcoming food shortages. One critical task was restoring, reorganizing, and upgrading agricultural research institutions inherited from British colonial rule and developed during the Pakistan period. A key decision in this regard was Presidential Order No. 32, issued on April 5, 1973, which established the Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) to systematically plan, coordinate, direct, and conduct a national agricultural research program. The government appointed Kazi M. Badruddoza as Executive Chairman of BARC, entrusting him with rebuilding the nation's agricultural research system after his return from internment in Pakistan in 1973.

At 46, Kazi Badruddoza was already a renowned agricultural scientist, internationally recognized for his contributions to the Green Revolution in South Asia. Trained as an agronomist, plant pathologist, and crop geneticist, he fostered an interdisciplinary approach to crop improvement. In 1964, he was appointed as Director of Research at the Pakistan Agriculture Research Council, where he worked closely with Nobel Laureate Dr. Norman Borlaug to develop semi-dwarf, high-yielding, and disease-resistant Mexican wheat varieties in Pakistan, marking the start of the Green Revolution in the region. These varieties led to the beginning of the Green Revolution which helped rapidly increase wheat production in Pakistan.

Dr. Kazi M. Badruddoza assumed the responsibility of leading Bangladesh’s agricultural research with a clear focus on initiating and supervising multiple endeavors across various fronts. His goal was to develop a coherent National Agricultural Research System

(NARS). Under Dr. Badruddoza’s dynamic and inspiring leadership as the Executive Chairman of the Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), major international donors took notice. They generously provided financial assistance to support these critical activities. Dr. Badruddoza’s astute leadership qualities allowed him to exert influence and work effectively with the administrative bureaucracy, including seasoned and renowned bureaucrats like A.Z.M. Obaiduallh Khan and A.M. Anisuzzaman. As a result, donors swiftly approved projects and released funds.

The investments made by the US Agency for International Development (USAID) and the World Bank led to the construction of modern facilities, upgrading the physical infrastructure of various institutes. These included a new facility for housing the Bangladesh Rice Research Institute (BRRI), a research center for the Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) at Joydebpur, four regional agricultural research stations, and the BARC headquarters with a unique architectural design at Farmgate in Dhaka. Additionally, with assistance from the Japan International Cooperation Agency (JICA), an institute for post-graduate studies in agriculture was established in Salna in 1983 as part of BARI. Grants from Australia, Japan, and the UK further supported the upgrading of research centers focused on sugarcane, citrus, vegetables, and tea.

In the mid-1980s, the Ministry of Agriculture announced further restructuring. Alongside physical facility construction and laboratory upgrades, numerous scientists were sent abroad for higher studies and training especially for their Masters and PhD degrees. This determined pursuit of infrastructure building and scientific human resources development led to the emergence of a robust NARS by 1985. The Bangladesh Agricultural Research Council is made the apex of this system, facilitating cooperation and collaboration between the country’s agricultural research institutions and international research centers. Thanks to these investments, Bangladesh reaped the benefits of the Green Revolution.

While countless scientists, government officials, and farmers contributed to this success story, Dr. Kazi M. Badruddoza's pivotal role cannot be overstated. His extraordinary personal integrity, scientific talent, administrative skills, and rapport with the international donor community made institution building within Bangladesh's NARS remarkably successful. Even as the system evolved over time, its strength still rests on the foundation laid during the 1970s and 1980s

My personal story with Kazi Sir is relatively short. I joined the council in late 1986 when he retired as Chairman of BARC. As a fresh recruit with an educational background in the USSR, a country not much liked by the then elites of Bangladesh's scientific community, I was a bit shy. Frequently I saw Kazi Sir, then National Scientist Emeritus, coming to the Council and felt amazed by the way he used to radiate his extraordinary demeanor and personality by holding a cigarette pipe in his lips, puffing from it and walking erect with head straight. It was really awesome and I preferred not to cross him and maintain a safe distance. But later in 1995, as a member of the drafting team of the Strategic Plan for the National Agricultural Research System (1995 - 2010), I got a wonderful opportunity of working closely with him, who led the drafting team and finalized the valuable document. Working closely with him during the drafting of the Strategic Plan for the National Agricultural Research System (NARS) must have been an enriching experience. It was an extremely rewarding experience for me. I also had the opportunity of working with him through participation in the review of several other national strategic papers and documents, for example, the draft national legislation on Farmers' rights in the context of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. His leadership undoubtedly shaped the trajectory of agricultural research in Bangladesh.

Dr Kazi M. Badruddoza lived a long life. He passed away on 30 August 2023 having lived 97 years. During his lifetime, he became a living legend inspiring a new generation of agricultural

scientists. Dr. Badruddoza was gifted with everything a decent human can dream of – academic brilliance, scientific thoughtfulness and imagination, foresight and canniness of an administrator, the benevolence for bestowing accolades to deserving scientists and common staff, a great heart for patient hearing and sharing of joys and sorrows of personal lives of subordinates – in short, a very noble person the likes of whom are rarely born.

Dr. Badruddoza's legacy lives on, not only through the institutions he helped build but also through the countless lives he touched. His generosity, wisdom, and commitment to recognizing and uplifting others continue to inspire generations. Indeed, he remains forever in the hearts of those who had the privilege to knowing him. In my short stint at the Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), I can't remember any staff who could say he/she returned from Kazi Sir with an empty hand. He would live forever deep in our hearts.

Author : Former Principal Scientific Officer, Bangladesh Agricultural Research Council, Dhaka, Bangladesh. Currently, International Consultant in Food and Agriculture based in Toronto, Canada

In Memory of my beloved father Dr. Kazi M. Badruddoza

Dr. Tasneem Omar Ali
USA

My beloved father Dr Kazi M Badruddoza passed away on 30 August 2023 due to age related complications. He was an eminent agriculturist of Bangladesh. He was National Emeritus Scientist. He was 96 years young and would have turned 97 on first day of 2024. At the time of his passing, he was surrounded by his son and my brother Dr Shaji Kazi & his daughter Nadia, and myself Dr Tasneem, & Ayesha along with all of my paternal family members, and at least a thousand of his junior colleagues from Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) and Bangladesh Agriculture Research Institute (BARI) both of which he founded in 1972 soon after creation of Bangladesh as independent state. Farid Uddin Ahmed and Mohammed Masum were present constantly in vigil at his bedside from start to end, sacrificing time from their families, and provided every conceivable service to my dad. Dr Ferdousi, Director of BARI facilitated our transport everywhere, and was present at the hospital daily to provide any needed service. I saw the grief on all their faces while they maintained their composure. Dad is truly lucky to have such devotion from all, Mashallah. He chaired his last meeting at BARC on August 15, 2023. Although getting weaker due to age, his mind was witty and sharp as ever till he passed. His loyal and dedicated aides Nazu and Ashish were ever present at his sides. My dad relied on Nazu's cooking. Ashish was my dad's right hand. I mean that he was indispensable to my dad. Even in the ambulance till the grave site, I saw Ashish rode with my dad, in his usual place in passenger seat next to driver.

He was devoted to his grandkids, having seen them grow from infants into adults on numerous visits to the US. He played basketball with Ayesha at his Uttara house when she was just one. He walked Ayesha back & forth to grade school, and upon invitation by her teacher, went to her kindergarten to give talks about his childhood, and finally one day, attended her university

orientation at UC Berkeley, ate lunch at her sorority, and enjoyed a bumpy golf cart campus ride with her college mates. He and Aalia were a team- he cheered her on at pony rides at her birthdays. Knowing Aalia's interest in fabric and textile industry, he arranged for a tour of a garment factory in Dhaka. In Dhaka, they also schemed together to get her a desi style nose piercing in which she proudly wears jewelry as a Dhaka memory of her grandfather. Even when getting weaker by the day, he grinned joyously & blew kisses to Aalia when FaceTiming at her university in BC! He particularly loved Iqbal, his son in law, who is also botanically inclined. He ordered his junior research scientists to give numerous tours of BARI's greenhouses, genetic labs and agriculture fields to Iqbal & I, and our kids over the years. Every time we FaceTimed him, until the very last call, just two weeks before he fell ill, he would ask me 'Where is my dear 'jamai' (son in law)' - and waited patiently till Iqbal joined the call.

The famously large and extraordinarily nutritious Kazi Guava named after my dad, is sold everywhere on the congested street corners and crowded street stalls to the gleaming, upscale grocery stores of Dhaka. The Kazi Guava was a product of his plant genetic engineering at BARI. Goal was to create a disease resistant, hardy, very large guava with minimum seeds, crispy texture and exact nutritional value as an apple. The Kazi Guava is a fun way to strike a conversation with anyone. At Iqbal's 35 th medical school reunion in Ireland, in July of 2023, his classmates and their wives, & even their kids were fascinated by the subject and instantly whipped out their phones to look it up!

To overcome famine, he used Plant Genetics both in post war Bangladesh and Vietnam. In the 1980s, as the Chief Geneticist of the Food and Agriculture Organization (United Nations) , he worked closely with Nobel Laureate Dr Norman Borlaug, father of the Green Revolution. Projects included creation of agent orange resistant rice crops in Vietnam putting an end to post war famine in that starving nation, resulting in a thriving economy of

that country today. When I now see instagram posts of young people vacationing in Hanoi (including Ayesha), and enjoying heaps of sticky rice in a bowl, I think to myself, ah my dad had something to do with that! Today, many such fruits, vegetables, rice and wheat plants, which are resistant to disease, chemical warfare and drought, are being genetically engineered and propagated at BARI which are then distributed to farmers. This has virtually eliminated famine in post 1971 war in Bangladesh, formerly known as East Pakistan. I realize this when Iqbal & I walk through food courts in malls and restaurants, and see the leftovers on plates abandoned by customers, and also scores of vegetables and multiple varieties of rice served at dinner invitations, fish abound and fruit sellers crammed on every corner of Dhaka's bustling streets. No longer can you see the malnourished kids of post war Bangladesh in their hospitals today, or squatting outside the mosques, hoping for a bite of rice & lentils. They may be there today but now, it is money they want in zakat. They have food, and are not malnourished. Food first, he said to us & his grandkids.

While many in Bangladesh are indebted to his services to his beloved country, and his agricultural resources, few of the younger population are aware of his magnificent contribution to Pakistan's agricultural cultural economy before the creation of Bangladesh as an independent state. However, since I was born in Karachi, while my father was the Director of Pakistan Agricultural Research Council , my four year old self remembers his large office, his full staff of peons, and the magnificent resources that Pakistan provided him to further their agricultural growth. They called him 'Doctor Saab' and gave him the utmost respect. There, he planted bananas in Sind province when bananas were an expensive commodity in the then West Pakistan. In East Pakistan, they grew everywhere but not in West Pakistan. Now they're sold in every street corner of present day Pakistan. He contributed heavily to the cultivation of multiple varieties of basmati rice in Pakistan. He was a very important representative of the agricultural genetics research in Pakistan in multiple

western countries particularly Russia. Long after my father had left for his beloved Bangladesh, many scientific officers from the Pakistan Agricultural Research Council would come and pay respects to us, his family in Karachi. They never forgot Doctor Saab.

My dad was blessed to have had FOUR janaza prayers, all of which were televised live on national television. First janaza was at his local mosque at which he was a regular worshipper over five decades (Iqbal has also prayed juma namaz there), second janaza at Krishibid Institute, third at his most beloved BARI & last janaza at his final place of rest in his ancestral village & place of birth, Govindganj which is 6 hours drive from Dhaka. My brother carried him the last few yards, along with others, to his final resting place and he was laid to rest in ancestral cemetery next to his father and mother, younger brother, and grandfather. The funeral procession from Dhaka to Govindganj was multiple BARC cars, all with government flags, and given right of way in the insanely turbulent Dhaka traffic.

Multiple TV camera crew circled around and interviewed us (myself, my brother & the kids) as well as news papers.

May Allah provide maghfirat and grant him highest level of Jannatul Firdous. Ameen.

Author : Internal Medicine Specialist, Daughter of Dr. Kazi M. Badruddoza.

My Dad Dr Kazi M. Badruddoza: The leader of people in Bangladesh

Jeffry Kazi

It's difficult to describe my father's life in words. To truly understand him, you had to be with him, live with him, work with him, and be his friend or colleague. He left an indelible impression on everyone he touched, whether friends, colleagues, or family.

My father was a man of character, integrity, intelligence, resilience, hard work, and rational behavior. He ensured his actions benefited others rather than himself. His personality was charismatic and pleasant, yet strong. He embodied the qualities of a true leader and was devoted to serving people rather than pursuing political ambitions. In all his endeavors, his country, Bangladesh, always came first.

He approached everything meticulously, organized, and seriously, always striving to be just and fair. With a strong and unwavering personality, he rarely changed his mind once it was made up. He cared deeply for his health and his family. Although religious, he was also very spiritual, respecting all faiths and people of every belief, caste, and creed.

He was a true Bangladeshi hero, one of the founders and leaders who contributed significantly to agriculture and feeding millions during the country's early days and beyond. He stood by his country when it needed him the most.

A man of his word, he always kept his promises. He loved his family deeply and held his country in high regard. May God bless his soul. Dad, I will miss you. Ameen.

Author : Gastroenterologist & Medicine Specialist, Son of Dr. Kazi M. Badruddoza.

শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ ড. কাজী এম. বরুদোজ্জা

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা
ছিলেন একজন স্বনামধন্য কৃষি বিজ্ঞানী,
ছড়িয়ে আছে তাঁর সুখ্যাতি বিশ্বব্যাপী,
জন্মগ্রহণ করেন **১৯২৭** সালের পহেলা জানুয়ারি
বাংলাদেশের বগুড়া শহরে তাঁর মামার বাড়িতে,

পৈত্রিক নিবাস তাঁর উত্তরবঙ্গের গাইবান্ধা জেলাতে
আর গ্রামের বাড়ি ঐ জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাতে,
তাঁর বাবার নাম কাজী এম. বদিউজ্জামান
ছিলেন একজন আইনজীবী।
মায়ের নাম মোছাম্মৎ জমিলা খাতুন
তিনি ছিলেন গৃহিণী ও ছয় সন্তানের জননী,
তাঁর বাল্যকাল কাটে গাইবান্ধা ও গোবিন্দগঞ্জে
স্কুল জীবনের লেখাপড়া শেষ হয় ঐ দুই জায়গাতে।

ড. বদরুদ্দোজার পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস
ছিল ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য মিরাটে,
তাঁর পিতামহ ছিলেন **১৮৫৭** সালে সংগঠিত
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন অগ্রসেনানী।

কিছু কাল পর তাঁর পিতামহ চলে আসেন বাংলাদেশে
স্থায়ী হন গাইবান্ধা জেলাতে
ছোট বেলা থেকে ছিলেন তিনি ভীষণ মেধাবী
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়া শেষ করেন তিনি গাইবান্ধাতেই।

মেট্রিক পাশ করেন **১৯৪২** সালে
ইংরেজি বিষয়ে লেটার নিয়ে
আই এসসি পাশ করেন **১৯৪৪** সালে
রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে,
ভর্তি হন ঢাকা এগ্রিকালচারাল ইন্সটিটিউটে **১৯৪৫** সালে,
বের হন **১৯৪৮** সালে বি এজি এবং **১৯৫২** সালে এম এ জি পাশ করে,

চাকুরি শুরু করেন পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে
গবেষণা সহকারী **১৯৪৮** সালে,
ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে যান যুক্তরাষ্ট্রে **১৯৫২** সালে
পিএইচডি করেন **১৯৫৬** সালে
পোস্ট ডক্টরেট সম্পন্ন করেন সুইডেনে **১৯৬১** সালে।

বাংলাদেশের কৃষির অগ্রগতিতে তাঁর অবদান অসামান্য
যা হয়ে থাকবে এ দেশের কৃষি উন্নয়নে অম্লান ও অনন্য,
কৃষি গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্গঠনে
একইসাথে দক্ষ জনবল তৈরি করে গবেষণার কল্যাণে

কৃষি গবেষণার আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিতে তাঁর নেতৃত্ব,
ভূমিকা ও কর্মতৎপরতা ছিল বিস্ময়কর ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন,
তিনি ছিলেন এদেশের আধুনিক কৃষির স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার
তাঁর নেতৃত্বে আজ দেশ কৃষিতে স্বনির্ভর।

বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে
দক্ষ গবেষক গড়ে তোলার স্বপ্নদ্রষ্টা
দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বুঝে
গবেষকদের উচ্চ শিক্ষায় পাঠাতেন বিদেশে

তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন আগামীদিনের কৃষিকে
সামনে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন হবে দক্ষ জনশক্তি, অর্থ ও গবেষণার পরিবেশ,

সেভাবেই গড়ে তোলেন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান
তিনিই করেছেন ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, রাখতে কৃষকের সম্মান

পুনঃবিন্যাস করেন বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা সিস্টেম
তাঁর হাত দিয়েই হয় বিএআরসি ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান
স্থাপন করেন দেশ বিদেশের উন্নত কৃষি গবেষণার সাথে সংযোগ
এ সবই তার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ।

ইউএসএআইডি, সিডা, জাইকা, বিশ্বব্যাংক
সহায়তা দিলেন সদ্য স্বাধীন হওয়া কৃষি সেক্টরে
তারা বুঝলেন সঠিক নেতৃত্বে আছে কৃষি গবেষণা
ক্ষুধা নিবারণ হবে এ দেশের উন্নত জাতের ফসলে

ধান ফসলের পাশাপাশি আসলো অন্যান্য ফসল
এর মধ্যে রয়েছে গম, ভূট্টা, সয়াবিন,
গবেষণা জোরদার করে বাড়ালেন চাষের এলাকা
প্রকল্প তৈরি করে করলেন বাস্তবায়ন
সেই সব কাজের ধারাবাহিকতায় আজ
গম ও ভূট্টা এ দেশে অন্যতম দানা শস্য হিসাবে চাষ হচ্ছে।

কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার মধ্যে সেতুবন্ধন
তৈরি করতে বিএআরআই এর অধীনে করেন ইপসা স্থাপন
পরবর্তীতে ইপসা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
বর্তমানে কৃষির বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডির উন্নত শিক্ষালয়।

বিএআরসি এবং বিএআরআই এর প্রধান নির্বাহী ছিলেন
এছাড়াও দেশে বিদেশের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে
ছিলেন পরিচালনা বোর্ড সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সদস্য,
নির্বাহী কমিটির সদস্য
সফল ভাবে পালন করেন সব দায়িত্ব।

এই মহান ব্যক্তির সাথে আমার পরিচয় ১৯৮০ সনের মার্চ মাসে
আমি তখন এমএসসি (এজি) এর ছাত্র বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে,
সেই সময় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দল ছাত্রের মধ্যে হয় সংঘর্ষ,
কয়েকজন ছাত্র হয়েছিল সেই ঘটনায় নিহত।

সেই দিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ,
আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাড়তে হলাম বাধ্য,
সেই সময় আমি দেখা করি বিএআরআই এর পরিচালক
ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা স্যারের সাথে।

তাঁর নিকট চাকরির জন্য করি আবেদন এবং
আমার কয়েকজন বন্ধুও আবেদন করেছিল,
সেই দিন তিনি আমাদের জন্য এডহক ভিত্তিতে
বিজ্ঞানী হিসেবে নিয়োগের জন্য করেছিলেন ব্যবস্থা ।

পরবর্তীতে তাঁরই হাত ধরে চাকুরি হয়েছিল স্থায়ী,
কাজেই চাকুরি জীবনের শুরু থেকে শেষ পযন্ত
নানাভাবে তাঁর সঙ্গে জড়িত অনেক স্মৃতি।

চাকুরিতে নিয়োগ ছাড়াও উচ্চতর ডিগ্রি ও প্রশিক্ষণ
এবং পদোন্নতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পেয়েছিলাম তার আশীর্বাদ।

কাজেই বিএআরআই এর চাকুরিতে যোগদান
এবং উচ্চতর পদে পদোন্নতি এবং সর্বশেষ মহাপরিচালক
হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে সব সময় তার
আশীর্বাদ ছিল আমার জন্য খুবই সহায়ক।

শ্রদ্ধাভাজন ও বয়োজ্যেষ্ঠ এই কৃষি বিজ্ঞানী
দীর্ঘদিন নি:সঙ্গ জীবন কাটানোর পর ২০২৩
সালের আগস্ট মাসের ৩০ তারিখ ৯৬ বৎসর
বয়সে এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন।

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় নিজ গ্রামের
পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়,
আসুন, মহান আল্লাহর নিকট তাঁর আত্মার মাগফেরাত
এবং তাঁকে বেহেস্ত নসিব করার জন্য করি প্রার্থনা।

লেখক : সাবেক মহাপরিচালক, বিএআরআই, গাজীপুর

প্রথিতযশা কৃষি বিজ্ঞানী ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজাকে নিয়ে কিছু স্মৃতিচারণ

রওশন এ রহমান

এদেশের কৃষি ও কৃষকের প্রাণ ড. কাজী এম বদরুদ্দোজার সাথে আমার জীবনের বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তরুণ বয়সে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে আমি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি শহরে পাড়ি জমাই ১৯৬৮ সালে। পাকিস্তানে পড়াশুনার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন আমার মামা প্রয়াত এবিএম শামসুল হুদা যিনি পাকিস্তান অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিসের ৬৫ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৬৯ সালে আমি বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে করাচি ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হই। ছয় মাস যেতে না যেতেই হঠাৎ করে মামা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা এজি অফিসে ডিএজি হিসেবে বদলি হয়ে যান। এমন একটি সময়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে আমি অসহায় হয়ে পড়ি।

মামার কাছে জেনেছিলাম ড.কাজী এম বদরুদ্দোজা করাচিতে পাকিস্তান কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সিনিয়র পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি গাইবান্ধার বিশিষ্ট আইনজীবী কাজী এম বদিউজ্জামানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমি মামার বাসায় সরকারি ডাইরেক্টরী থেকে তার ঠিকানাটা সংগ্রহ করে তার সাথে অফিসে দেখা করার চেষ্টা করি। আমি তখনও স্যার সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। একদিন আমি স্যারের অফিসে গিয়ে কর্মরত ২/১ জন বাঙালি কর্মচারীর সাথে স্যার সম্বন্ধে জানতে চাই। তারা সবাই এক বাক্যে জানান স্যার একজন খুব ভালো মানুষ তবে মেজাজ খুব কড়া। এরপর একদিন করাচি গার্ডেন রোডে স্যারের বাসায় হাজির হই। এই প্রথম স্যারকে দেখলাম। ছোটখাট মানুষ, গুরু গম্ভীর চেহারা, মুখে চুরুট। তিনি আমার কাছে তার সাথে দেখা করার কারণ জানতে চান। সেইসাথে তিনি জানতে চান কোথা থেকে এসেছি। আমি স্যারকে সব খুলে বলি। সেদিন তিনি আমাকে তেমন কিছু বলেননি। পরে একদিন স্যারের বাসায় গিয়ে আমার পিতার পরিচয় ও একটি চিঠি দেওয়াতে তিনি জানালেন তারা উভয়ে স্কুল জীবনে সহপাঠী ছিলেন। সেদিন আমার সমস্যার কথা স্যারকে বলাতে তিনি জানান, তোমাকে কীভাবে সাহায্য করবো?

তোমারতো ১৮ বছর বয়স হয়নি তাছাড়া তুমি লেখাপড়াও শেষ করনি। এরপরও আমি তাকে একটা চাকুরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি যাতে আমি আমার লেখাপড়ার খরচ ও থাকা খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে পারি। সেদিন তিনি আমাকে কোন আশ্বাস না দিলেও শুধু জানালেন আমার সাথে যোগাযোগ রেখ। করাচিতে অজানা অচেনা নতুন পরিবেশে এই মহান ব্যক্তিটির সাথে আমার পরিচয় হওয়াতে আমি একজন অভিভাবক হিসেবে স্যারকে পেয়েছিলাম। সেই সুবাদে স্যারের সহযোগিতা, স্নেহ ভালবাসা অনেককিছুই পেয়েছি যা পরবর্তী জীবনেও আমার চলার পথের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছেন। এর পরের ইতিহাস অনেক বড় যা এই স্বল্প পরিসরে লেখা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলতে পারি তার সহযোগিতা এবং প্রচেষ্টায় করাচীতে আমি নাজিমাবাদ সরকারি প্রিমিয়ার কলেজ হতে ছয় মাস মেয়াদি একটি "ডিপ্লোমা ইন স্পেশাল লাইব্রেরিয়ানশিপ এন্ড বিবলিওগ্রাফি" কোর্স সম্পন্ন করি। এই কোর্সটি সম্পন্ন করার কারণেই পরবর্তীতে পাকিস্তান এরিড জোন রিসার্চ স্কিমে লাইব্রেরিতে আমি ইষ্ট পাকিস্তান কোটায় জুনিয়র বিবলিওগ্রাফার পদে চাকুরিতে যোগদান করি ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, যা সম্ভব হয়েছিল স্যারের কারণে। স্যারের সাথে আমার যোগাযোগ সেখান থেকে শুরু পরবর্তী সময়ে আমি দেশে ফিরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে যোগদানের পাশাপাশি ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্সে লেখাপড়া করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করি। জীবনের একটা দীর্ঘ সময় তার কাছাকাছি পাশাপাশি থাকায় তার সাথে আমার বহু স্মৃতি রয়েছে।

গত ১৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে আমার পুরানো ডায়েরি ঘাটতে গিয়ে স্যারের হাতের লেখা একটি চিঠি ও একটি বিয়ের দাওয়াত পত্র আমার দৃষ্টিগোচর হয়। চিঠিটি তিনি ১৯৯১ সালের ১লা জুলাই আমেরিকার শিকাগো থেকে আমাকে লিখেছিলেন। তেত্রিশ বছর আগে লেখা তার এই চিঠিটি পেয়ে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। তার ভালোবাসার বহু স্মৃতি মনের কোণে ভিড় করে। তিনি নেই কিন্তু তার লেখা চিঠিটি আমাকে অনেক কিছু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। চিঠিটি একবার দুবার নয় বেশ কয়েকবার পড়লাম এবং আমার কাছের মানুষদের সাথে শেয়ার করলাম। তিনি লিখেছিলেন তার একমাত্র মেয়ে তাসনিম বদর ছোটু এর বিয়েতে তড়িঘড়ি করে সেখানে যোগদানের

পূর্বে তিনি তার কাছের সহকর্মীদের অনেককে বলে যেতে পারেননি। এটা তার মনঃকষ্টের একটি কারণ ছিল। তাই তিনি আমাকে স্মৃতিচারণামূলক এই চিঠিটি লিখে তাঁর মেয়ের জন্য দোয়া চাওয়ার পাশাপাশি বিয়ের কার্ডও চিঠির সাথে পাঠিয়ে দেন। এই চিঠিটি পড়লে বোঝা যায় তিনি কতটা উদার সহজ সরল আর বড় মাপের মানুষ ছিলেন। সবার অবগতির জন্য স্মৃতিচারণামূলক এই চিঠিটি সাথে সংযুক্ত করলাম।

ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা স্যারের মত মেধাসম্পন্ন, স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উদার ও বড় মাপের একজন বিজ্ঞানী এদেশে আর জন্মাবে কিনা জানি না, তবে তাঁর কাজের মাঝে তিনি বেঁচে থাকবেন এদেশের কৃষি কৃষক ও সাধারণ মানুষের মাঝে চিরকাল। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

লেখক : সাবেক প্রিন্সিপাল টেকনিক্যাল অফিসার ও উপ পরিচালক (সংস্থাপন)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা।

রওশন সাহেবের কাছে লেখা ড. বদরুদ্দোজার চিঠি

Apt#1115B
903 South Ashland Av
Chicago, ILL 60607
USA

My Dear Rawshan,

Upon my arrival in the USA on 22 June via London, I could organize and hold marriage of Chouto on 29 June 1991. The time was so short that it was impossible for me to invite even over phone my associates, relatives and friends at distant places outside Dhaka. A letter of thanks prepared hurriedly and jointly with the groom's side was delivered to the persons gracing the occasion. A copy of this is now sent to you to inform you the order of events of the day so that you can realize the problems I have had to organize things in the short span of time. I am writing this letter hoping that all of you will excuse me for my failure to invite you before marriage and also hoping that you will extend your blessings to the newlywed couple. Also bring this fact to the notice of Dr. Gul Hossain, Razzaque and others.

Around 140 guests including several US residents of Bangladesh were kind enough to attend the function. There were 35 guests of groom's side. The boy is now a citizen of Canada and the UK, originally from Trinidad. He is a doctor (M.D) at the Mayo Hospital, Minnesota and of 31 years.

With all the best,

Sincerely,

Kazi M. Badruddoza

1.7.91

Apt.# 1115B
903 South Ashland Av.
Chicago, ILL. 60607
USA

My dear Rawshan:

Upon my arrival in the USA on 22 June via London, I could organise and hold marriage of Chounti on 29 June 1991. The time was so short that it was impossible for me to invite even over phone my associates, relations and friends at distant places outside Dhaka. A letter of thanks prepared hurriedly and jointly with the groom's side was delivered to the persons gracing the occasion. A copy of this is now sent to you to inform you of the order of events of the day so that you can realize the problems I have had to organise things in the short span

of time. I am writing this letter hoping that all of you will excuse me for my failure to invite you before marriage, and also hoping that you will extend your blessings to the newly wed couple. Also, bring this fact to the notice of Drs. Gul Hosseini, Razzaque and others.

About 140 guests including several US residents of Bangladesh were kind enough to attend the function. There were 35 guests of groom's side. The boy is now a citizen of Canada and the UK, originally from ~~citizen~~ Trinidad. He is a doctor at The Mayo Hospital, Minnesota, US and of 31 yrs.

With all the best wishes,

Sincerely,
Kazi M. Badruddoza

কৃষির কিংবদন্তি ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা

ড. ফেরদৌসী ইসলাম আইভি

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা ছিলেন একজন কিংবদন্তী কৃষি বিজ্ঞানী। বাংলাদেশের খাদ্য স্বনির্ভর কৃষি নিয়ে আজ আমাদের যে গর্ব, তার মূল রূপকার হলেন ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা। এ দেশের কৃষির এমন কোনো সেক্টর নেই যেখানে তাঁর পদচারণা বা অবদান নাই। তিনি এমনই এক মহীরুহ যার সম্পর্কে বর্ণনা করতে হলে নিজের অনেক যোগ্যতা ও দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়। আমাদের সে যোগ্যতা হয়ত নাই। আমার সৌভাগ্য যে কৃষির এই মহান ব্যক্তির সঙ্গে আমার শৈশব থেকে বড় হয়ে ওঠা অবধি কিছুটা সম্পর্ক ছিল। রক্তের সম্পর্কের বাইরের এই মানুষের মহানুভবতা, আর স্নেহের পরশ পেয়ে আমি ধন্য। ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজাকে ঘিরে আমার রয়েছে অনেক স্মৃতি। এ বিষয়ে কিছু বলার আগে ব্যক্তি ড. কাজী বদরুদ্দোজা বিষয়ে কিছু বলতে চাই। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণায় তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য, সরব, গতিময় ও অনুকরণীয়। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষিবিজ্ঞানী এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন এই কৃষি ব্যক্তিত্বের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং-৩২ জারিকরণের মাধ্যমে কৃষি গবেষণার উন্নয়ন ও সমন্বিত কার্যক্রমের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং-৬২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এছাড়াও দেশের সকল কৃষি বিষয়ক সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের জন্য তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল স্থাপিত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), বাংলাদেশ মৎস্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এবং ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরই নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত

ইপসা পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি ইনস্টিটিউট (বিনা) পুনর্গঠন করেন। শুধু দেশেই না, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান রয়েছে। আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, International service for National Agricultural Research (ISNAR) প্রতিষ্ঠা লগ্নে তাঁর অবদান বাইরের জগতে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম গভর্নিংবডির সদস্যও ছিলেন তিনি। এছাড়াও ভিয়েতনামের জেনেটিক্স ইনস্টিটিউট, পাকিস্তানের এরিড জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রভৃতি স্থাপনেও তাঁর অবদান রয়েছে।

বর্ষীয়ান এই কৃষিবিজ্ঞানী তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে মেধা ও পরিশ্রমের দ্বারা বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি ব্রিটিশ বাংলায় উদ্ভিদ প্রজননকারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শস্য ও ফসল ব্যবস্থার উন্নতিতে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। এরপর তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থা (এনআরএস) গঠনে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার আনতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বাংলাদেশে কৃষির যে অবকাঠামো দেখা যায় তার বেশির ভাগই ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার সক্রিয় উদ্যোগের ফসল। তিনি উচ্চ ফলনশীল ফসলের বিভিন্ন জাত উন্নয়নেও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার গবেষণার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের গম ও ভুট্টা ফসলের চাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সম্মানের প্রতীক হিসেবে জনপ্রিয় জাত "কাজী পেয়ারা" ড. কাজীর নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নাল ও ম্যাগাজিনে তাঁর অনেক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি বই এবং মাসিক ম্যাগাজিনে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে কৃষিক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে বহু পুরস্কার ও খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। পাকিস্তান আমলে তিনি তঘমা-ই পাকিস্তান এবং তঘমা-ইমতিয়াজ খেতাব লাভ করেন। তিনি ১৯৮২ সালে বেগম জেবুন্নেসাা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ কল্যাণ ট্রাস্ট সম্মাননা লাভ করেছিলেন। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'ইমেরিটাস

সায়েন্টিস্ট’ পদে ভূষিত করেন।

বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট ১৯৯১ সালে তাঁকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৯৯ সালে কনসালটেটিভ গ্রুপ অব ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চ ও বিশ্বব্যাংক ওয়াশিংটন ডিসিতে তাঁকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে। ভারতের বিশ্ব উন্নয়ন সংসদ তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। এছাড়াও বাংলাদেশ হর্টিকালচার সোসাইটি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস রিসার্চ কাউন্সিল, প্লান্ট ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, আবু হোসেন সরকার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার, রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও তাঁকে বিভিন্ন সময় স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। তিনি ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে বিএআরসির চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রথম বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় বিজ্ঞানীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে ২০১২ সালে কৃষি গবেষণা ও প্রশিক্ষণে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজাকে দেশের সবচেয়ে সম্মানিত পুরস্কার স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করেন।

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজার শিক্ষাজীবন ছিল অতি গৌরবের। তিনি ১৯৪২ সালে মাধ্যমিক এবং ১৯৪৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রি অর্জনের পর ভর্তি হন উপমহাদেশের প্রথম কৃষি কলেজ তেজগাঁওস্থ বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটে, বর্তমানে যেটি শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সুপরিচিত। সেখান থেকে ১৯৪৮ সালে বিএজি এবং ১৯৫২ সালে এমএজি পাশের পর কর্মজীবন শুরু করেন এগ্রিকালচার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। এরপর ‘ফুল ব্রাইট স্কলারশীপ’ নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানকার বিখ্যাত লা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পর দেশে ফিরে কৃষি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিশ্বের অনেক দূরদর্শী ও খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। এদের মধ্যে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. নরম্যান ই বোরলগ, ভারতের গ্রিন রেভুলিউয়েশন এবং কৃষির পথিকৃৎ ড. স্বামীনাথন এবং বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান বিজ্ঞানীগণ উল্লেখযোগ্য।

স্মৃতির পাতা অনেক লম্বা.........

কৃষির এই প্রবাদ পুরুষ ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা যার স্নেহধন্য পরশ

পাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। স্মৃতির পাতায় জমে আছে অনেক স্মৃতি। তাঁর বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আমি স্মৃতি কাতর হয়ে পড়ি। স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত কৃষির পথিকৃৎ, ইমেরিটাস সাইন্টিস্ট ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা, একজন কিংবদন্তী, একজন অসাধারণ মানবিক গুনাবলি সম্বলিত অভিভাবক ও কঠোর প্রশাসক বলে সুপরিচিত ছিলেন। আমার বাবার সূত্র ধরে উনার বিষয়ে জমে আছে অনেক স্মৃতি। শুনেছি তৎকালীন উনার প্রিয় ২/১ জন নীতিবান অফিসারের মধ্যে আমার বাবা মরহুম ড. আশরাফুল ইসলাম, প্রাক্তন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট একজন ছিলেন। আমার জন্মের পর মেয়েকে খাঁটি দুধ খাওয়াবে বলে আমার বাবা একটা গরু কিনেছিলেন। পাবনা কৃষি ফার্ম পরিদর্শনে গিয়ে যখন বদরুদ্দোজা স্যার সেই গরু দেখেন, আমার বাবাকে নাকি অনেক বকা দেন। উনার বক্তব্য হলো অফিস প্রধান হয়ে কেন তার গরু থাকবে! পরদিনই নাকি বাবা ভয়ে গরু উধাও করে দিয়েছিলেন।

ছোট্টবেলায় কাজী স্যারকে দেখেছি নেকার বুকার প্যান্ট পরিহিত শুকনা পাতলা কাঠামোর গড়ন এবং ঠোঁটে চুরুট থাকত। উনি এলে আম্মা সুতা দিয়ে বেঁধে গোটা মুরগির রোস্ট করতেন, দৌঁড়ে গিয়ে আমরা সালাম করলে কিছু টাকা হাতে দিতেন। চুরুট খাওয়া আর মাছ ধরা ছিল উনার শখ। তাই উনার জন্য বাবা বড়শি দিয়ে মাছ ধরার জন্য পাবনা ফার্মে ব্যবস্থা রাখতেন। স্যারের জীবনের শেষের দিনগুলো বড় একাকিত্বে কেটেছে। সেই কঠোর প্রশাসক হয়ে গিয়েছিলেন শান্ত ছোট শিশুর মত, সারাদিন নিচের ঘরটাতে সোফায় শুয়ে থেকেই দিন কাটাতেন। কিন্তু গবেষণার দিক নির্দেশনা থেকে শুরু করে কোন ধরনের গবেষণা এ মুহূর্তে করা দরকার সব কিছুই ফোন করে করে সবাইকে নির্দেশনা দিতেন। কর্ণ ওয়েল বা ভুট্টার তেল উৎপাদনসহ অ্যাভোকাডো, বারি মাল্টা-১ এর গাছ বেশী করে লাগানোর পরামর্শও দিতেন।

জীবনের শেষ সময়গুলোতে খুব ঘুরতে চাইতেন। তিনি বলতেন-আমাকে চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বরিশাল, ঈশ্বরদী এ স্টেশনগুলোতে নিয়ে চলো। বর্তমানে গবেষণা প্লট কীভাবে ব্যবস্থাপনা করছে আমি দেখতে চাই। আমার পরামর্শ হয়ত তোমাদের কাজে লাগতে পারে। আমি মরে গেলে আমার পরামর্শ

আর পাবে না। স্যারের এ বয়সে উনাকে নিয়ে গাড়িতে এতদূর পথ যাওয়ার সাহস পেতাম না। আমি বলতাম আপনি জাতীয় সম্পদ, আপনার কিছু হলে তখন! তখন বলতেন- আমি লিখে দিচ্ছি তোমার কোনো দোষ হবে না।

আমি বলতাম এত দূর যেতে পারবেন? তখন বলতেন- হ্যাঁ পারবো। গাড়িতে করে একেক কেন্দ্রে থেমে থেমে যাব, প্রয়োজনে প্লেনে যাব। আবার বলতেন- বাংলাদেশের ছোট ছোট প্লেনে ভয় লাগে, অবশ্য তুমি থাকলে ভয় কম পাবো। তখন আমি বলি-আমি নিজেই তো ভয় পাই, হেসে বলে আমি আছি না, কত যে গল্প। আবার বলতেন চিন্তা করো না, তোমার টিকিটের টাকাও আমি দিব, তুমি শুধু ছুটি নাও। আহারে কত যে স্নেহ আর আবদার মাখানো অনুভূতি। সব সময় আমার কাছে ৫০০ টাকা করে জমা রাখতেন। এটা হলো বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে মাঝে মাঝে সবজি দিতাম তার মূল্য বাবদ। আমি বলতাম, এত সামান্য টাকার সবজি কি আমি খাওয়াতে পারবো না! বলতেন- 'তুমি এর চেয়ে বেশী পারবে আমি জানি, কিন্তু এটা আমার দৈনন্দিন অন্ন। এটা আমার টাকায় করব। উনার কতগুলো নীতি ছিল যেটা সত্যিই অনুকরণীয়। মাঝে মাঝে দুঃখ করতেন,আর বলতেন কিছুদিন আগে যদি হাঁটুর অপারেশনটা করতাম, তবে হাঁটতে পারতাম। আমি সান্ত্বনা দিতাম যে, আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং স্মৃতিশক্তি তো ভাল আছে, এগুলো যদি না থাকত তবে হেঁটে কি করতেন! তখন বুঝতো। পছন্দের খাদ্য তালিকায় ছিল খেজুরের পাতালি গুড়ের ফিরনি, মুরগির রোস্ট (তবে লেগ পিচ হতে হবে), কলিজা ভুনা দিয়ে লুচি। আর কোরবানির ঈদের পূর্বে বলতেন ঝুরা গরুর মাংস, গরুর ভুঁড়ি খাওয়াবে। অনেক স্মৃতি! মানুষকে ভালোবাসতেন। উনার বাসায় কেউ গেলে কফি না খেয়ে আসতে দিতেন না। সন্তানদের সঙ্গেও ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় বন্ধন। প্রতি বছর ছেলে, মেয়ে, নাতনি দেখতে আসতেন। তখন ব্যস্ত হয়ে পড়তেন তাদের খাওয়া, উপহার দেওয়া বিষয়গুলো নিয়ে। সব মিলিয়ে অসাধারণ মানবীয় গুনাবলীর ব্যক্তি ছিলেন। আত্মীয় স্বজনসহ অসংখ্য সহকর্মীদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সম্মান নিয়ে গত ৩০ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. এই মহান কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আল্লাহ আপনাকে বেহেস্তের শ্রেষ্ঠতম স্থান দিয়ে সম্মানিত করুক।

লেখক : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

স্মৃতির পাতায় ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা

ড. এম. এ. মজিদ

আমার পূর্ববর্তী লেখায় ড. কাজী বদরুদ্দোজা স্যারের বায়োগ্রাফি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কর্মসংশ্লিষ্টতা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দিক থেকে কাজী স্যারের সাথে আমার অনেক মধুর স্মৃতি রয়েছে। সেসব স্মৃতির কিছু খণ্ডচিত্র হৃদয়ের মানসপট থেকে এখানে তুলে ধরার প্রয়াস নিচ্ছি। কাজী স্যারের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৮৩ সালে। আমি তখন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সহকারী অধ্যাপক। মৎস্য পুষ্টি বিষয়ে একটি কন্ট্রাক্ট রিসার্চকে কেন্দ্র করে আমি প্রথম কাজী স্যারের সাথে দেখা করি। স্যার তখন বিএআরসির চেয়ারম্যান। প্রকল্পটির ওপর সমালোচকের অযৌক্তিক মন্তব্যের বিষয়ে স্যারের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি। আলোচনায় বুঝতে পারলাম তিনি আমার যৌক্তিক ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন, বলেছেন মৎস্য পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা না হলে মৎস্যখাদ্য তৈরি হবে কি করে, মাছ চাষ হবে কি করে, আর উৎপাদনই বা বাড়বে কীভাবে। তিনি প্রকল্পটি অনুমোদনের আশ্বাস দিয়ে ব্যাখ্যা-মতে একটি পত্র তাঁর বরাবরে প্রেরণের জন্য বললেন। স্যার পরবর্তীতে প্রকল্পটি অনুমোদন দিয়েছিলেন। তখন থেকে স্যারের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়।

পরবর্তীতে দীর্ঘ ১৬ বছরকাল ধরে প্রধান নির্বাহী পরিচালক/মহাপরিচালক হিসেবে বিএফআরআই গড়ে তোলা এবং আমার নেতৃত্বে উদ্ভাবিত বিভিন্ন মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণা দেখে মৎস্য গবেষণার প্রতি কাজী স্যারের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একদিন বাংলাদেশ টেলিভিশনে কৈ মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ প্রযুক্তির সচিত্র প্রতিবেদন ও আমার সাক্ষাৎকার দেখে স্যার আমাকে উনার বাসায় ডেকে পাঠান। স্যার তখন নিজের উত্তরার একটি ছোট বাসায় অবসর জীবন কাটাতেন। স্যার বললেন, তোমার কৈ মাছের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের খবর টেলিভিশনে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। তাছাড়া তোমাদের শিং, মাগুর, পাবদা, গুলশা, তেলাপিয়া, পাঙাস মাছের প্রযুক্তির প্রচারণাও দেখেছি। জানতে চাইলেন এইসব প্রযুক্তির সম্প্রসারণের অবস্থা। আমার কথা শুনার

পর স্যার বললেন, এ প্রযুক্তিগুলি কৃষক পর্যায়ে মাঠে নিতে হলে তোমাদের মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে হবে, চাষী-পুকুরে প্রদর্শনী খামার স্থাপনসহ মৎস্য আহরণ কালে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মাঠ সভা আয়োজন করতে হবে এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হব। এতে স্পষ্ট বুঝা যায়, স্যার সর্বদা গবেষণা ও সম্প্রসারণ সংস্থার মধ্যে কার্যকর কর্ম-যোগাযোগ স্থাপনে অতিশয় গুরুত্ব দিতেন। স্যার একদিন আমার বয়স জানতে চাইলেন। আমার বয়স বলার পর কিছুটা নিরাশ দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার (বাগ) এর ফেলো করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার বয়সতো পঁয়তাল্লিশ হয় নাই। এতৎসত্ত্বেও বাগের প্রায় নির্বাহী কাউন্সিলের সভায় স্যার আমাকে ডাকতেন। এভাবে স্যারের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ ও আন্তরিকতা বাড়তে থাকে। পরে ২০০১ সালে স্যার আমাকে বাগের ফেলো হওয়ার জন্য নিজেই নমিনেশন দেন এবং আমাকে বাগ এর ফেলো করা হয়।

হঠাৎ বাগের জেনারেল সেক্রেটারির পদ শূন্য হওয়ায় ২০১৯ সালের মে মাসে নির্বাহী কাউন্সিলের এক সভায় অ্যাকটিং জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে কাজী স্যার আমার নাম প্রস্তাব করে বসলেন। উপস্থিত সকল সদস্য সম্মতিও জানালেন। আমি একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমি এই বলে অপারগতা জানালাম যে, এই পদে কৃষির প্রধান খাত অর্থাৎ ফসল খাতের একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর প্রয়োজন। আমি মৎস্যবিজ্ঞানী হিসেবে বলতে চাই যে, এ পদের জন্য আমি সব চেয়ে উপযুক্ত নই। বাগ এ অনেক ফেলো আছেন ক্রপস সেক্টরে। সেখান থেকে কেউ একজন হলে ভালো হয়। এবার স্যার একটু কঠিন হয়েই বললেন, আমি মনে করি, তুমিই উপযুক্ত। নিরুপায় হয়ে স্যারের আদেশে আমাকে জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব নিতে হল। উত্তরায় আমার বাসা কাছাকাছি হওয়ায় স্যার অন্তত: সপ্তাহে ২/৩ দিন আমাকে সকাল, বিকাল, রাতে বাসায় ডেকে পাঠাতেন। এভাবে বাগের কাজের সাথে সাথে প্রথমত: ব্যক্তিগত ও পরে পারিবারিকভাবেও কাজী স্যারের সাথে জড়িয়ে গেলাম। যাঁরা উনার স্বভাব সম্পর্কে জানেন, তারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, স্যারের মাথায় কোন একটা কিছু ঢুকলে তা সবসময় মাথায় ঘুরতে থাকবে। দিনে কয়েকবার ফোন করে

জিজ্ঞেস করবেন কাজটি কতদূর হলো। কাজের প্রতি উনার মতো সিরিয়াস মানুষ খুব কম দেখা যায়।

জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার কিছুদিন পর আমাকে বিএফআরআই এর চাঁদপুর কেন্দ্রে ইলিশ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। চাঁদপুর যাওয়ার জন্য সস্ত্রীক স্যারের দোয়া নিতে বাসায় গেলে স্যার দোয়া করলেন; জিজ্ঞেস করলেন চাঁদপুর আইড় মাছ পাওয়া যায় কি না। বললাম পাওয়া যায়। আমি আপনার জন্য নিয়ে আসব। দুই সপ্তাহ পরে চাঁদপুর থেকে ফেরার সময় ২ টি বড় আইড় মাছ নিয়ে আসলাম। পরের দিন আমার স্ত্রী নাসিমা একটি আইড় ভুনা করে ও আরেকটি আইড় পাক না করে দুপুরে খাওয়ার আগে আমিসহ স্যারের বাসায় নিয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী নিজ হাতে তুলে স্যারকে খাওয়ালেন। স্যার তৃপ্তিমত খেলেন যদিও তিনি খুব স্বল্পভোজী। স্যার কফি খেতে পছন্দ করতেন। স্যার জানালেন এখানে ভালো কফি পাওয়া যায়না। স্যারের পছন্দের কফির নাম বললেন। পরদিন কয়েক দোকান খুঁজে স্যারের পছন্দের ব্র্যান্ড এর কফি পেয়ে গেলাম। কিনে নিয়ে স্যারকে উপহার দিলাম। এরপর থেকে আমি নিয়মিত স্যারের জন্য স্যারের পছন্দের কফি ও কফিমেট নিয়ে যেতাম। স্যার একবার আমার স্ত্রীর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেন আলুর দম দিয়ে লুচি খাবেন। তাই আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে আলুর দম ও লুচি বানিয়ে স্যারকে খাইয়ে আসতো। এটা স্যারের প্রিয় খাবার ছিল। স্যার এর ইচ্ছানুযায়ী আমার বাসায় এসেছেন কয়েকবার। আমার স্ত্রী নিজ হাতে স্যারের পছন্দের খাবার রান্না করে মায়াবী হাতে মুখে তুলে খাইয়েছেন। এভাবে স্যার আমাদের পরিবারের সকলকে ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে আমাদের একান্ত আপন হয়ে গেলেন। বলতে গেলে স্যার নিজের বাসায় একা থাকতেন; স্ত্রী, সন্তানরা বিদেশের স্থায়ী বাসিন্দা। একজন গৃহসহযোগী নাজু ও একজন সেবক আশীষ স্যারের দেখাশুনা করে। তবে সিনিয়র কৃষিবিদগণ নিয়মিত স্যারের বাসায় যাওয়া-আসা করতেন, স্যার যাতে কখনো একাকিত্ব অনুভব না করেন সেদিকে খেয়াল রাখতেন। অসুখ বিসুখে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেন।

স্যার বাগের কাজের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতেন এবং করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের অগ্রগতি জানার জন্য দিনে

৪/৫ বারও ফোন দিতেন। পরে এক সময় সস্ত্রীক আমি নিজেই স্যারের বাসায় উপস্থিত হয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করতাম। দাপ্তরিক আলাপ শেষে অনেকক্ষণ ধরে স্যারের সাথে কথা হতো। স্যার নানা কথার মাঝে বিভিন্ন অনুভূতি, আবেগ, আবদার, একান্ত ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতেন। আমরা দুজনে স্বপ্রণোদিত হয়ে অংশগ্রহণ করতাম, স্যারকে জানার ও বুঝার চেষ্টা করতাম। জানুয়ারির ০১ তারিখে স্যারের জন্মদিন। কখনো আমি, মাসুম ভাই, শামসুল আলম ভাই, হামিদুর রহমান সাহেব মিলে মিষ্টিসহকারে কেক কেটে স্যারের অনাড়ম্বর জন্মদিন পালন করতাম। কোন কোন বছর আমি আমার স্ত্রী মিলে কেক, ফতুয়া অথবা পাঞ্জাবী নিয়ে যেতাম। স্যার কেক কাটতেন, আমার স্ত্রী খাইয়ে দিতেন, আশীষ ছবি তুলতো যা পরে ফেসবুকে স্থান পেতো। বিদেশ থেকে টেলিফোনে ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনীরা শুভেচ্ছা জানাতো, এভাবেই স্যারের জন্মদিন পালন হতো প্রতিবছর। আমার সহধর্মিনী মাঝে মাঝে স্যারের পছন্দের সুস্বাদু খাবার রান্না করে নিয়ে গিয়ে নিজ হাতে মুখে তুলে খাইয়ে দিতেন। স্যার কিছু খেয়ে বাকিটা পরে খাবেন বলে নাজুকে (গৃহসহযোগী) তুলে রাখতে বলতেন। আহা, আজ সব কেবলই স্মৃতি।

বাগ/কেজিএফ প্রকল্পের দুই দিনের প্রথম 'এ্যাওয়্যারনেস ওয়ার্কশপ' বিএফআরআই, ময়মনসিংহে ৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। তখনো করানোর প্রাদুর্ভাব বিদ্যমান। স্যারকে বললাম, আপনাকে জুমে সংযুক্ত করে দিব। স্যার অনেকটা অনুযোগের সুরে বললেন, তুমি এ পর্যন্ত আমাকে তোমার ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাওনি। বললাম স্যার একরাত্র থাকতে হবে। স্যার বললেন, কোন অসুবিধা নাই, আমার করানো হবেনা। পরে আমি ও প্রকল্প সমন্বয়কারী আবুল কালাম আযাদ সাহেব মিলে পরিষেবক আশীষসহ স্যারকে ময়মনসিংহে নিয়ে গেলাম। আমার স্ত্রীও সফরসঙ্গী হলেন। বিএফআরআই এর অতিথি ভবনে রাত্রিযাপন করলাম। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ কাজী স্যারের কর্মজীবনের ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে বিশাল সম্বর্ধনা প্রদান করলেন। স্যার হুইল চেয়ারে ঘুরে ঘুরে সকল গবেষণা পুকুরের মাছ দেখলেন এবং ইনস্টিটিউশনের মহাপরিচালক চলমান গবেষণা কার্যক্রম বর্ণনা করলেন। স্যার খুব খুশি হলেন এবং মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জানালেন। সফরে

উপস্থিত কেজিএফ এর নির্বাহী পরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাসকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নে স্যার বিশেষ নজর দিতে বললেন যাতে এ দু'টি সেক্টরের উন্নয়নে গবেষণা ইনস্টিটিউট দুটি আরে বেশি অবদান রাখতে পারে। হাটুর আর্থারাইটিস এর কারণে স্যার একদমই হাঁটতে পারতেন না। তথাপি তিনি যে কোন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণে হুইল চেয়ারে চলে যেতেন।

প্রায় ঈদেই আমার স্ত্রী পোলাও, রোস্ট, টিকিয়া, ফিরনি রান্না করে দুজনে মিলে স্যারের বাসায় নিয়ে যেতাম। আমার স্ত্রী নিজ হাতে স্যারকে খাইয়ে দিত। স্যারের স্ত্রী, সন্তান সবাই প্রবাসী। স্যার শুধুই একা। শুধুই আবেগ, অনুভূতি, নীরব একাকিত্ব। এ এক কঠিন বাস্তবতা। তবে এই বাস্তবতাকে তিনি মেনে নিয়েছেন বলে মনে হতো। এ বিষয়ে স্যারের মধ্যে কখনো কোনো কষ্টবোধ লক্ষ্য করিনি।

আমার সন্তানরাও স্যারকে পছন্দ করতো, মায়া করতো। আমার মেয়ে, মেয়ে-জামাই, নাতনি বেশ কয়বার গিয়েছে উনাকে দেখতে। স্যার তাঁদের সাথে গল্প করতো, স্যার এর বড় সন্তান কীভাবে মারা গিয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। ২০২২ সালের ২৪শে আগস্ট কাজী স্যার আমার আমেরিকা প্রবাসী ছেলে ড. নাভিদ জুবায়ের অয়ন ও বউমা ড. দেয়া তাসমিমকে বাসায় দাওয়াত করেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর স্যার বউমাকে একটি চমৎকার শাড়ি উপহার দেন। স্যার বক্স খোলে শাড়িটি গায়ে জড়িয়ে দেখাতে বললেন। গায়ে জড়ানোর পর একটু হেসে বললেন তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। মানুষের প্রতি স্যারের যে স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালাবোসার মন রয়েছে, এটা তারই নিদর্শন। তিনি সামাজিকতা মেনে চলতেন।

কাজী স্যার বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের সমৃদ্ধি নিয়ে নিরন্তর স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর চিন্তা চেতনায় আর কিছু ছিল না। ফল উৎপাদন নিয়ে তিনি খুব ভাবতেন। যে মাটিতে সোনা ফলে সে দেশে ২,৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে ফল আমদানি করতে হয়, এটা তাঁকে পীড়া দিত। কাউকে পেলেই তিনি মাল্টা, কাজু বাদাম, স্ট্রবেরি, ড্রাগন, এভোকাডো ইত্যাদির উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার এবং ফলচাষীদের অর্থায়ন ও আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বলতেন। তাঁদের মাঝে

উন্নতজাতের ফলের চারা ও বীজ বিতরণের পরামর্শ দিতেন। এ লক্ষ্যে তিনি বাগের উদ্যোগে ২৩ জুলাই ২০২২ তারিখে 'বছরব্যাপী পুষ্টিকর ও উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদন' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করেন। তাঁর পরবর্তী চিন্তা ছিল ভুট্টার তেল উৎপাদন। বাংলাদেশে যে পরিমাণ ভুট্টা উৎপাদন হয় তা থেকে তেল উৎপাদন করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। তিনি আমাকে অনেকবার পরামর্শ দিয়েছেন 'একজন ভাল উদ্যোক্তা খোঁজ করে বাগের কারিগরি সহায়তায় ভুট্টার তেল উৎপাদন সম্ভাবনা যাঁচাই করতে'। এ লক্ষ্যে তিনি বিএআরসি, সিমিট, এমএবি এবং বিডাব্লিওএমআরআই এর সহযোগিতায় 'ভুট্টা উৎপাদন এবং এর বহুমুখী ও বিকল্প ব্যবহার' শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করেন। কর্মশালায় দেশি-বিদেশি অনেক ভুট্টা বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার সুপারিশ হলো বাংলাদেশে যেসব জাতের ভুট্টার চাষ হয়, এগুলো মূলত পশুখাদ্য ও আটা হিসেবে মানুষের খাওয়ার উপযোগী। সে জাতগুলো থেকে সীমিত পরিমাণ ভুট্টার তেল উৎপাদন সম্ভব, কিন্তু বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্ভব নয়। তাই অন্য দেশ থেকে তেল উৎপাদন ও পশু খাদ্য উপযোগী ভুট্টার জাত এনে গবেষণার মাধ্যমে অধিক তেল উৎপাদনশীল জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করে দেশে উৎপাদন ও এর সম্প্রসারণ করতে হবে। দেশের কৃষি উন্নয়ন নিয়ে এসব ভাবনা স্যারের সুদূরপ্রশারী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ।

কাজী স্যার বাগের তহবিল গঠন নিয়ে খুব চিন্তা করতেন। স্যার অনেকবার আমাকে 'বারি' থেকে জমি নিয়ে মাল্টার বাগান করতে বলেন। এতে একদিকে মাল্টার গবেষণা হবে, মাল্টাচাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে, অন্যদিকে বাগের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থের স্থায়ী উৎসের সৃষ্টি হবে। তবে স্যারের এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন কঠিন মনে হওয়ায় আমি কখনো বারি কর্তৃপক্ষের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করিনি। আমার এই উদ্যোগহীনতা আজ আমাকে পীড়া দেয়।

কাজী স্যার শুধু একজন প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ও দক্ষ ব্যবস্থাপকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বড়মাপের কৃষি দার্শনিক। অবসরপ্রাপ্ত কৃষিবিজ্ঞানীদের অবদান রাখার সুযোগ তৈরির জন্য তিনি বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার (বাগ) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কৃষি উন্নয়নে জাতীয় কৃষি গবেষণা

সিস্টেম ও সকল প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো তৈরি করে গেছেন। স্যার আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি নিজ কর্মগুণেই আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন। তবে তাঁর কৃষি দর্শন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আমরা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে পারি। আমি স্যারের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্যারকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন।

লেখক : সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার

হৃদয়ের পংক্তিমালা

(ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্মরণে)

ড. মোঃ গোলাম হোসেন

তিনি একজন কাজী বদরুদ্দোজা -
বাংলাদেশে জন্ম নেয়া এক কিংবদন্তী কালজয়ী পুরুষ,
যাঁকে চিনে সারা বিশ্ব - চীন, ভারত, পাকিস্তান, ইতালী, ভিয়েতনাম এবং
যুক্তরাষ্ট্রের মতো অনেক দেশ।

সবচেয়ে বেশি চিনে তাঁকে এই সবুজ বাংলার অগণিত কৃষক - যাঁরা ফুল্ল
ফসলে ভরে তুলে অবারিত মাঠ,
চোখ জুড়ানো শ্যামল-সবুজ ধান ক্ষেত,
গম, ভুট্টা জমিন, পেয়ারাসহ অনেক ফলের বাগান।

তিনি একজন কাজী বদরুদ্দোজা -
যাঁর জন্ম না হলে -হয়তবা ফসল এবং ফলের জমিন, এই মাঠ শূন্য পতিত
পরে থাকতো;
যাঁর জন্ম না হলে - হয়তবা নাটোর এবং এতদ এলাকার কাজী পেয়ারার
বাগান থাকতো বৃক্ষবিহীন।

তিনি একজন কাজী বদরুদ্দোজা -
যাঁর জন্ম না হলে - এদেশে হয়তবা কৃষি গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর
কঠিন হতো, হয়তবা এতো বিজ্ঞ কৃষিবিদদের ধান, ফল ও মাছের জাত
উন্নয়নে অবদান সম্ভব হতো না।

সর্বোপরি - বুকের পাঠা ফুলিয়ে কৃষি উন্নয়নের মডেল হিসেবে আজকের
এই বাংলাদেশকে নিয়ে গর্ব করা কঠিন হতো।

তিনি একজন কাজী বদরুদ্দোজা -
বাংলাদেশে জন্ম নেয়া কিংবদন্তী এক কালজয়ী পুরুষ।

লেখক : এশিয়া রিজিওন্যাল কোঅর্ডিনেটর, ফিড দি ফিউচার ইনোভেশন ল্যাব ফর ফিস,
সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

পিতৃতুল্য পরম শ্রদ্ধেয় ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজাঃ

আরতি সরকার

ড. বদরুদ্দোজাকে আমার পিতৃতুল্য বললেও যথার্থ হবে না। উনি ছিলেন আমার জীবনে এর চাইতেও আরো বেশি। আমার ভাষার সীমাবদ্ধতার জন্য সঠিক শব্দটি আমি ব্যবহার করতে পারছি না। ১৯৯৫ সাল। আমার চাকুরি জীবনের মাত্র এক বছর সময় থেকে আমি স্যারের সাথে কাজ শুরু করেছি। আমার অবসরকাল পর্যন্ত আমিই স্যারের সহকারী ছিলাম। আমার বাবার কাছে আমি স্যারের মহানুভবতার গল্প করতাম। আমার বাবা একদিন আমার স্যারের সাথে দেখা করানোর আবদার করলেন। আমিও বাবাকে স্যারের কাছে নিয়ে আসলাম। স্যার আমার বাবাকে সযত্নে আপ্যায়ন করলেন। আমার বাবা খুবই খুশি হলেন। যাওয়ার আগে স্যারের সাথে হাত মিলিয়ে বিদায় নেয়ার সময় বললেন, এখন থেকে আরতি আপনার আরেক সন্তান। আপনার স্নেহে তাকে রাখবেন। আরতি এখন থেকে আপনার মেয়ে। আমার বাবা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু নিয়ে গেলেন এক মহাপুরুষের স্মৃতি। বাবার জীবন মনে হলো সেদিন ধন্য হলো। আমার বাবা ১৯৯০ সালে মারা গেলেন। কিন্তু স্যারের স্নেহ, স্যারের ছেলে মেয়ের নিয়মিত যোগাযোগ, আমার ও আমার পরিবারের অন্য সকলের খোঁজ খবর নেয়া আমার বাবার মৃত্যুর সকল দুঃখ যেন ভুলিয়ে দিয়েছিল। আজ স্যার নেই, কিন্তু স্যারের ছেলে মেয়েরা আজও আমার ও আমার পরিবারের সকল সদস্যের খোঁজ খবর নিয়মিত নিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক যেন আমি তাদের আরেক বোন। আমার মতো গর্বিত সন্তান আর কে আছে? স্যার আমাকে সকল সমস্যার সময়ে আগলে রাখতেন। আমার জন্মদাতা পিতা আমাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন। আর স্যার আমাকে আমার চলার পথ দেখিয়েছেন।

স্যারের সাথে প্রায় তিন যুগ ছিলাম। স্যার সম্পর্কে আমার উপলব্ধি হলো উনি ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর। মানুষকে সাহায্য করতে স্যারের কেমন এক ধরনের উৎসাহ। উনার ব্যক্তিত্ব কেমন ছিল সে কথা বলার মতো যোগ্যতা আমার নাই। অনেকে সাহস করে স্যারের রুমে আসতে কয়েকবার দরজা খোলা বাঁধা করতো। স্যারকে দেখে মনে হতো ভীষণ মেজাজি। সব সময় কাজে ব্যস্ত। এর মাঝে উনাকে ডিস্টার্ব করার সাহস অনেকের হতো না।

স্যার কোনো সময়ে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সময় নষ্ট করতেন না। তাই কেউ আসলে কী বলতে চায় তা শুনে বিদায় করে দিতেন। কিন্তু যিনি সাহস করে একবার ঢুকে তার চাওয়াটা বলে ফেলতে পেরেছেন, তাকে প্রথমে একটা বকা দিয়ে বলতেন, আমি কি এখন চেয়ারম্যান নাকি মহাপরিচালক যে আমার কথা শুনবে। যাও, আমি পারবো না। যাওয়ার আগে বলতেন, নাম ঠিকানা দিয়ে যাও। দেখি কিছু করতে পারি কি না। কিন্তু কিছু আশা করো না। উনারা আমার কথা শুনবে না। বাস্তবে, স্যার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু যিনি সাহায্যের জন্য আসতেন, তাকে কিছুই বলতেন না। দেখেছি, কত মানুষ স্যারের এই ধরনের বকাঝকা দিয়ে তার অজান্তেই সে ব্যক্তির উপকার করে বসে থাকতেন।

শুধু আমি নই, স্যারের স্নেহভাজন সকলের খবর স্যার প্রতিনিয়ত নিতেন। স্যার বিদেশে গেলে প্রায় প্রতি সপ্তাহে ফোন করে আমার পরিবারের সকলের কথা জানতে চাইতেন। এছাড়া, অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীর খবর নিতেন। বলতে গেলে, একজন বাবা যেমন সন্তানকে আগলে রাখেন, আমাকেও স্যার সেভাবেই আগলে রেখেছিলেন। আমি যখন ২০০৫ সালে আমার সন্তান প্রসবের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হলাম স্যার অফিসের অন্য সহকর্মীদের মাধ্যমে আমার খবর নিতেন। আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরদিনই স্যার আমাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন। এতবড় মাপের একজন মানুষ আমাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন, তখন অনেকে স্যারকে দেখতে আসলেন। উনাকে চিনেনা বা উনার নাম শুনেনি এমন ডাক্তার নার্স নেই। আমার মনে হলো সেদিন আমার সামনে ভগবান এসেছিলেন।

২০০৩ সালে স্যার আমাকে ও আমার স্বামীকে নিয়ে স্যার এর দেশের বাড়ি গোবিন্দগঞ্জ নিয়ে যান। গোবিন্দগঞ্জে রয়েছে স্যারের বাবা, মা, দাদা ও দাদীর কবর। পারিবারিক কবরস্থান। স্যার বললেন, স্যারের মৃত্যুর পর স্যারকে যেন উনার বাবার পাশে সমাহিত করা হয়। স্যার আরও অনুরোধ করলেন, স্যার মারা গেলে স্যারের সাথে আমিও যেন গোবিন্দগঞ্জ যাই। স্যার আমাদেরকে স্যারের বাড়ি ঘুরিয়ে দেখান। স্যারের পৈতৃক বাড়ি গোবিন্দগঞ্জ। গাইবান্ধা স্যার পরে বাড়ি করেছিলেন। গ্রামের সকল আত্মীয় স্বজনের সাথে স্যার আমাদের মেয়ে ও মেয়ের জামাই হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। স্যারের সব

আত্মীয় স্বজনেরা আমাকে মেয়ে হিসেবেই দেখতো।

স্যারের স্মরণ শক্তি ছিল খুবই প্রখর। ৭-৮ বছর আগে থেকে স্যারের হাত কাঁপা শুরু হয়। নিজ হাতে খেতে গেলে খাবার পড়ে যেতো। বাসায় স্যারের সহযোগী আশীষ ও নাজু স্যারকে খাইয়ে দিত। অফিসে আসলে আমিই খাইয়ে দিতাম। আমি যেদিন স্যারের বাসায় যেতাম, স্যার আমার হাতেই খেতে পছন্দ করতেন। স্যার খেতে খেতে আমার সাথে পরিবারের গল্প করতেন। অফিস থেকে স্যারের ছেলে মেয়ের সাথে মাঝে মাঝে কথা বলতেন। অনেক সময় স্যারের স্ত্রী যাঁকে আমি আন্টি বলে ডাকতাম, তিনি ফোন ধরতেন। তিনিও আমার ও আমার পরিবারের খোঁজ খবর নিতেন। অনেক সময়ে মেয়ে জামাই ফোন ধরতেন। সবার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এভাবেই আমি স্যারের পরিবারের সাথে এক গভীর ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে গেলাম।

স্যার অফিসে আসলে আমি স্যারকে খাওয়ানোর জন্য কিছু রান্না করে নিয়ে আসতাম। স্যার আমার রান্না খুব পছন্দ করতেন। এক একদিন এক এক খাবার খেতে চাইতেন। বলতেন, আগামীবার একটু চিংড়ি বা খাসির মাংস বা একটু সবজি অথবা লাবড়া রান্না করে নিয়ে এসো। একবার স্যার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। স্যারকে প্রায় প্রতিদিন দেখতে যেতাম। আমি গেলে স্যার খুব খুশি হতেন। একদিন হাসপাতালে বেডে শুয়ে স্যার বললেন, তোমার কচু দিয়ে ডাল রান্নাটা খুব ভালো লাগে। আগামীকাল রান্না করে নিয়ে এসো। হাসপাতালের খাবার ভালো লাগে না। আরেকদিন স্যার আলুর দম খেতে চাইলেন। আমি রান্না করে নিয়ে গেলাম। স্যারের মৃত্যুর আগের দিন আমি নিজ হাতেই স্যারকে সকালের নাস্তা খাইয়েছিলাম। বিকেলে স্যার আনারস খেতে চাইলেন। ফরিদ স্যার আনারস কিনে আনেন। আমি আনারস চেপে রস বের করে স্যারকে সামান্য খাওয়াতে পেরেছিলাম। কিন্তু একদিন পরই স্যারের শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। বিকেলে স্যার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। আমি এবার সত্যি সত্যি পিতৃহারা হয়ে গেলাম। মনে হলো, আমি আমার অভিভাবক হারিয়ে ফেললাম।

স্যারের নির্দেশ মোতাবেক আমি স্যারের মৃতদেহ নিয়ে অন্যান্যদের সাথে গোবিন্দগঞ্জ যাই। স্যারের ইচ্ছে মোতাবেক স্যারকে স্যারের বাবার পাশে শায়িত করানো হয়। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো ২০০৩ সালে স্যার আমাকে যাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন উনাদের কেউ আমাকে ভুলেন নি। সবাই আমাকে পরিবারের সদস্যের মতো আদর আপ্যায়ন করেন। বড়রা আমাকে নাম ধরে ডাকছে। ছোটরা দিদি বা আপা বলে ডাকছেন। মনে হলো আমি আমার বাড়িতেই এসেছি। এখন স্যার আমাদের মাঝে নেই। তবুও গাইবান্ধা বা গোবিন্দগঞ্জ থেকে স্যারের আত্মীয় স্বজনেরা আমাকে ফোন করে কুশলাদি জানতে চায়।

স্যার নেই। কিন্তু স্যারের কিছু স্বভাব আমি রপ্ত করতে চেষ্টা করি। স্যার সময়কে খুব গুরুত্ব দিতেন। কোন মিটিংয়ে স্যার দেরি করতেন না। সকাল ১০ টায় মিটিং হলে ট্র্যাফিক জ্যাম হতে পারে ভয়ে স্যার উত্তরা থেকে ফার্মগেট আসার জন্য সকাল ৮ টায় গাড়িতে চড়তেন। নয়টায় স্যার অফিসে পৌঁছে যেতেন। স্যার দুই হাতে মানুষকে সাহায্য করতেন। নিজের সামান্য পেনশনের টাকা এবং ছেলে মেয়ের দেয়া টাকা দিয়ে স্যার চলতেন। কিন্তু স্যারকে কেউ সামান্য হেল্প করলেই তার হাতে ১০০-২০০ টাকা গুঁজে দিতেন। কত জন কত ভাবে স্যারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেতেন সে কথা বলে শেষ করা যাবে না। অফিসের গাড়ি ড্রাইভার বাসায় গিয়ে অফিসে নিয়ে এসে আবার বাসায় দিয়ে আসতেন। ড্রাইভারকে খাইয়ে দিয়ে হাতে কিছু টাকাও দিয়ে দিতেন। আগেই বলেছি চাকুরির জন্য সুপারিশ করতে স্যার খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু যিনি আসতেন, তাকে বুঝতে দিতেন না।

এমন একজন অভিভাবক পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। সবাই চলে যায়। কিন্তু কিছু মানুষের চলে যাওয়া সকলের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। স্যারকে প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ে। স্যারের জন্য আশীর্বাদ করি। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন স্যারকে পরপারে চির শান্তিতে রাখেন।

লেখক : অফিস সহকারী, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

ইমেরিটাস বিজ্ঞানী মরহুম ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্যারের সাথে পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিসমূহ

মোঃ এখলাছ উদ্দীন

স্যারের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে। কৃষিবিদ ড. এম. আসাদুজ্জামান স্যার আমাকে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচারে চাকুরির সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যান। ড. বদরুদ্দোজা স্যার আমার ইন্টারভিউ নিয়ে আমাকে যোগদানের নির্দেশ দেন। আমি ড. আসাদুজ্জামান এর কাছে চির কৃতজ্ঞ কারণ উনি আমাকে এ সুযোগটি করে না দিলে আমি কোনোদিন এত বড় মাপের মানুষের মুখোমুখি হতে পারতাম না। স্যারকে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগও পেতাম না। আমার কাজে যোগদানের সময় থেকে স্যারের শেষ দিন পর্যন্ত আমি স্যারের সাথে সন্তানের মতোই ছিলাম। কখনও ভুলের জন্য বকা দিয়েছেন, আবার কখনও কঠিন কোন কাজ সফল ভাবে করতে পারার জন্য অনেক প্রশংসা করেছেন। স্যার আসলে বকা দিলেও আবার আদর করে বুঝিয়ে দিতেন আমি কি ভুল করেছি। ভালোবাসা আর বকা মিলে আমি স্যারের খুব কাছে যেতে পেরেছিলাম। এমন মহৎ মানুষটি আজ নেই, ভাবতে কষ্ট হয়। জীবনে স্যারকে দেখবো না, ঠিক যেন ভাবতে পারি না।

স্যারের সাথে দীর্ঘ ২৭ বছর চলার পথে পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের অনেক স্মৃতি রয়েছে। আমার এ লেখায় তার কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

মৃত্যুর প্রায় ১০ বছর আগে থেকে স্যার কখনও কোন কারণে বাইরে গেলে স্যার কেউ একজনকে সাথে নিয়ে যেতেন। আমি প্রায় সময় স্যারের সাথে যেতাম। একবার আমেরিকা দূতাবাসে গিয়েছি স্যারের সাথে। ভিসা অফিসার স্যারকে বললেন আপনি বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ কৃষিবিজ্ঞানী। আমেরিকায় আপনার ছেলে মেয়ে ও আপনার স্ত্রী থাকেন। আপনি গ্রিন কার্ড নিয়ে স্থায়ী ভাবে আমেরিকায় বসবাস করলেইতো পারেন। আপনাকে বার বার ভিসার জন্য আসতে হয় না। স্যার ভিসা অফিসারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আমি আমার মাতৃভূমিকে ভীষণ ভালোবাসি।

এই বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতি বছর আমি আমার ছেলে মেয়ে ও আমার স্ত্রী, আমার নাতনীদের দেখতে যাই। কিছুদিন সেখানে থাকি। আবার দেশে ফিরে আসি। দেশে আমার অনেক কাজ। আমি সব সময় চেষ্টা করি, এ দেশের কৃষির উন্নয়নের জন্য কিছু করতে। সরকার আমাকে সায়েন্টিস্ট ইমেরিটাস বানিয়ে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন। কাজেই আমাকে দেশেই থাকতে হবে। ভিসা অফিসার স্যারকে ধন্যবাদ জানালেন এবং পাসপোর্ট রেখে অভিনন্দন জানালেন।

দূতাবাস থেকে বের হয়ে স্যারের সাথে গাড়িতে উঠে স্যারকে বললাম, স্যার আপনি দেশকে অনেক ভালোবাসেন। তখন স্যার আমাকে বললেন, ভালোবাসি বলেই এই বাংলাদেশে কৃষির এত উন্নতি হয়েছে। স্যার বললেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের কৃষির উৎপাদন বলতে তেমন কিছুই ছিল না। তখনকার সরকার প্রধান আমাকে ডেকে বলেছিলেন, কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ দেশের ৮৫% মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই যত দ্রুত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় সেই উদ্যোগ যেন আমি নিই। স্যারের নিরলস চেষ্টায় নাকি স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রে নতুন নতুন কৃষি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল। ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবিত হয়েছিল। দেশে খাদ্য ও ফল মূল উৎপাদনের উন্নতি হলো। ধান, গম, ভূট্টা, সয়াবিন, নানা জাতের ফল দেশে অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হতে শুরু হলো। পৃথিবীতে এত অল্প সময়ে কৃষির এমন সাফল্য খুব কম দেশেই হয়েছে। মোট কথা ড. বদরুদ্দোজা স্যারের নেতৃত্বে কৃষির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি ও জনবল গড়ার কারণেই কৃষির প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছে এই বাংলাদেশে। একারণেই স্যার শস্য শ্যামল বাংলাদেশ, শস্য ভরা মাঠ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে যেতে চান নি। দেশের আপামর জনতা, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যত সরকার এসেছে সবাই স্যারকে স্মরণ করেছে। আগামীতেও করবে।

১৯৯৫ সাল। ড. গুল হোসেন স্যার তখন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিটের পরিচালক। ঝিনাইদহের মহেশ্বর চাঁদা গ্রামের দুই জন প্রাগ্রসর কৃষক তাদের গ্রামের কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নত প্রযুক্তির তথ্য সংগ্রহে ড. গুল হোসেন সাহেবের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।

উনাদের একজনের নাম আইয়ুব হোসেন ও অন্যজন ওমর আলী। একটি সাধারণ গ্রামের দুই জন কৃষক গ্রাম উন্নয়নের ভাবনায় এতদূর এসেছেন। তাই ড. গুল হোসেন স্যার তাঁদের দুই জনকে কাজী স্যারের কাছে যান। স্যার খুব মনোযোগ সহকারে তাঁদের কথা শুনে বললেন, আপনারা আগ্রহী হলে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার একটি কাজ করতে পারে। একাডেমি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধান ও ফসলের যে সব জাত অবমুক্ত করেছে আমরা আপনাদের ফাউন্ডেশন বীজ দিয়ে আপনাদের মাধ্যমে চাষাবাদ করে দেখতে চাই ইনস্টিটিউট কর্তৃক যে উৎপাদন পাওয়া যায় বলে দাবি করা হয়, সে উৎপাদন আপনারা পান কি না। আমরা আপনাদের শুধুমাত্র কারিগরি ও উপদেষ্টা সাপোর্ট দেব। সব কাজ আপনারা আপনাদের টাকায় করবেন। তাঁরা রাজি হলেন।

ড. গুল হোসেন স্যার আরেকটি প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন ক্ষেতের আইলের কারণে অনেক জমি নষ্ট হয়। আপনারা রাজি থাকলে আমরা ক্ষেতের আইল কেটে যৌথ খামার পদ্ধতিতে চাষ করতে বলবো। যার যতটুকু জমি আছে আনুপাতিক হারে তিনি সে পরিমাণ ফসল পাবেন। উনারা এ প্রস্তাবেও রাজি হলেন। একাডেমি দুইটি ইনস্টিটিউট থেকে ধান ও সবজি বীজ সংগ্রহ করে ঝিনাইদহের মহেশ্বর চাঁদা গ্রামে পাঠালেন। একাডেমি থেকে গুল হোসেন স্যার দুই ইনস্টিটিউটের কয়েকজন কৃষিবিজ্ঞানীকে নিয়ে কোন ফসল কীভাবে চাষ করবেন, কি পরিমাণ সার দেবেন, কখন দেবেন এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে চলে আসলেন। আইয়ুব আলী ও ওমর আলী সাহেবের উদ্যোগে সারা গ্রামে এসব ফসল উৎপাদন করা হলো। ফসল কাটার সময় হলে গ্রামের কৃষকেরা আবদার করলেন কাজী বদরুদ্দোজা স্যারকে সশরীরে তাদের ফসল কাটা দেখতে হবে। স্যার রাজি হলেন এবং গেলেন। সাথে নিয়ে গেলেন ড. গুল হোসেন স্যারকে, কৃষি ও ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর দুই মহাপরিচালক ও কয়েকজন পরিচালককে। এছাড়াও মহেশ্বর চাঁদার লোকজন নিয়ে গেলেন একই অনুষ্ঠানে এলজিইডি এর কর্ণধার প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী এবং তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীকে। এ অনুষ্ঠানে আরও যোগ দিলেন স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

ফসল উৎপাদনে তাঁরাা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেন। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহেশ্বর চাঁদা ও এর আশেপাশের গ্রামের লোকজনকে সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝানো হলো যে ভালো বীজ থেকে ভালো ফসল হয়। স্যার বললেন, কৃষি ইনস্টিটিউট থেকে যে সব ফসলের জাত অবমুক্ত হয় সে বীজ মাঠ পর্যায়ে যেতে যেতে বিভিন্ন পর্যায়ে মিশ্রণ ঘটে বিধায় আমরা প্রত্যাশিত উৎপাদন পাই না। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী, কাজী স্যার ও জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী স্যারের উপস্থিতি সকল গ্রামবাসীকে কৃষির উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। শুধু মহেশ্বর চাঁদা নয়, আশেপাশের গ্রামেও প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হয়েছে।

এরপর কাজী স্যারের পরামর্শে মহেশ্বর চাঁদা গ্রামের কৃষি উন্নয়ন, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মৎস্য এবং গ্রামীণ বনায়ন কর্মসূচিসহ সার্বিক উন্নয়নের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাগ্রসর চাষি জনাব মরহুম ওমর আলী, জনাব মরহুম আইয়ুব হোসেন, জনাব হেলাল উদ্দীন এবং মোছাঃ মর্জিনা বেগম ও গ্রামবাসী বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচারকে তিন একর জমি রেজিস্ট্রি করে দেন। উক্ত দানকৃত জমির উপর একাডেমি ১৯৯৭ সালে এলাকার চাষিদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'সেন্টার ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (কার্ড)' নামের একটি কৃষি কেন্দ্র গঠন করে। অত:পর একাডেমি স্থানীয় এলাকাবাসীদের ছোট ছোট গ্রুপে সংগঠিত করে উন্নত কৃষি ও মৎস্য চাষ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং কৃষি গবেষণা, ধান গবেষণা, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে অধিক ফলনশীল জাতের বীজ, মাছের পোনা, সরবরাহ করে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে। একাডেমির এই উদ্যোগের ফলে উক্ত গ্রামের ফসল উৎপাদন অনেকাংশে বেড়ে যায়। এ ছাড়া কেঁচো সার উৎপাদন ও ফসলের মাঠে প্রয়োগের মাধ্যমে বিষ মুক্ত শাক সবজি, ফল মূল ও খাদ্য উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে মহেশ্বর চাঁদা গ্রামের চাষীদের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে।

গ্রামের প্রতিটি বসতবাড়িতে গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। একাডেমি কৃষি গবেষণা থেকে উন্নত জাতের ফল গাছের কলম সরবরাহ করে। গ্রামের এক কিলোমিটার রাস্তার দুই পাশে তাল গাছ, আমলকী, হরতকি, বহেরা,

কদবেল, আম, জাম, বেল, লিচু এবং সফেদা গাছের চারা বপন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যে গ্রামবাসি তাঁর সুফল পেতে আরম্ভ করে। এসব গাছ থেকে মানুষের পাশাপাশি পশু পাখিও উপকৃত হয়েছে। সবচেয়ে বড় উপকার হয়েছে পরিবেশের। কাজী স্যারের অবদানের কথা এখনও গ্রামের মানুষেরা বলেন।

স্যার জীবিত থাকা অবস্থায় মহেশ্বর চাঁদা গ্রামের ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও এলাকার অন্যান্য গ্রামের লোকেরা ঢাকাতে স্যারের বাসায় এসে খোঁজ খবর নিতেন। স্যারের নির্দেশে আমি ও বেশ কয়েক বার মহেশ্বর চাঁদা গ্রামের কৃষির অবস্থা দেখতে যাই।

২০১২ সালে যশোরের খাজুরীয়ায় একটি কৃষি মেলা ও কৃষি ভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। ঢাকা থেকে ড. বদরুদ্দোজা স্যার, ড. এম. গুল হোসেন স্যার, কৃষিবিদ শফিকুল আলম (দিদার) ও আমি সে অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালকসহ অন্যান্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। এছাড়াও ছিলেন এলাকার সংসদ সদস্য ও কৃষক সংগঠক, প্রাগ্রসর চাষি জনাব আইয়ুব হোসেন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এলাকার প্রায় কয়েক হাজার কৃষক, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং সংবাদপত্র ও মিডিয়ার লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। কৃষিমেলা ও কৃষিভিত্তিক কর্মশালা ছাড়াও এলাকার মানুষের ও স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর মূল আকর্ষণ ছিল ড. বদরুদ্দোজা স্যার।

ঢাকা থেকে আগত মহাপরিচালকগণ ও এলাকার সংসদ সদস্য ও আইয়ুব হোসেন ছাড়াও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এরপর ড. এম. গুল হোসেন স্যারের মুখ থেকে ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্যারের স্মৃতির কথা শুনাতে অনুরোধ করলেন। ড. এম. গুল হোসেন স্যার কাজী স্যারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে যে অবদান তার বিশ্লেষণ করে এলাকার মানুষদের বুঝিয়ে দিলেন, কাজী স্যার দেশের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বাংলাদেশের মানুষ স্যারকে তাঁর অবদানের জন্য সারা জীবন মনে রাখবেন।

এরপর ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্যার বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। প্রথম কথায় স্যার বললেন, আমি আপনাদের এলাকায় কৃষির উন্নয়ন দেখে খুব খুশি হয়েছি। আরও বেশি খুশি হতাম যদি এক দুইজন কৃষককে মঞ্চে দেখতে পেতাম এবং আমাদের পাশে বসে কৃষির সাফল্য ও সমস্যার গল্প বলতেন। সারা জীবন কৃষকরা সরকারি কৃষি কর্মকর্তাদের কথা শুনেছেন। এই নিয়ম পরিবর্তন করে কৃষকের কথা শুনতে হবে, তা হলে দেশের কৃষকদের কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটবে। এরপর, স্যার কৃষির উন্নয়নের জন্য কী কী করা উচিত তার একটি উপদেশমূলক বক্তৃতা দেন। পিনপতন নীরবতায় উপস্থিত সকলে স্যারের বক্তৃতা শুনেন।

আমার জানামতে স্যার নিয়মনীতির বাইরে কোনো কাজ করেন নাই। স্যারের নিকট সাহায্য সহানুভূতির জন্য এসে কোন মানুষ খালি হাতে ফিরে যেতে আমি কখনো দেখি নাই। স্যারের জীবনটি দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন, স্যারের একটি মাত্র চিন্তা ছিল: দেশের কৃষিকে কীভাবে উন্নত করা যায়, কীভাবে কৃষকদের কৃষিতে ধরে রাখা যায়। এ চিন্তা সারাক্ষণ করতেন। স্যার নিজের জীবন নিয়ে কখনো চিন্তা করেন নাই।

স্যার উত্তরায় অতি ছোট একটি বাসায় বাস করতেন। দেখলে অবাক লাগে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কৃষিবিজ্ঞানী এত সাধারণ একটি বাসায় বাস করতেন। স্যার আমার জীবনে বটবৃক্ষের মত ছায়া প্রদান করে গেছেন। স্যারের সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। স্যার প্রতিনিয়ত আমার পরিবারের সকল সদস্যদের খোঁজ খবর নিয়ে থাকতেন।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্যারের সাথে আমি থাকতে পেরেছি এটাই আমার বড় প্রাপ্তি। স্যার জীবিত নেই, কিন্তু আমি যত দিন বেঁচে থাকবো আমার স্মৃতির পাতায় ততদিন মনের মাঝে থাকবে আমার প্রাণ প্রিয় স্যার ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা স্যার।

লেখক : অফিস সহকারি, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার

ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা:
বাংলাদেশের কৃষিপিতা ও দূরদর্শী এক ব্যক্তিত্ব

ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

আমি ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৭ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে চাকুরি করতাম। তখন আমাকে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে আসতে হতো। সেখানে অনেক সময় আলোচনায় ড. কাজী বদরুদ্দোজা এর নাম শোনা যেত। তাঁকে আমি তখনও না দেখলেও তিনি যে কৃষির একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সে আমি বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে চাকুরিকালীন সময়েই বুঝেছিলাম। আমি যখন ১৯৮৭ সালে কাউন্সিলে যোগদান করলাম তখন ড. বদরুদ্দোজা স্যার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) থেকে অবসর নিয়ে ভিয়েতনামে কনসালট্যান্ট হিসেবে চাকুরি করছেন। সবাই ড. বদরুদ্দোজা স্যারকে কৃষিগুরু হিসেবে সম্মান করতেন। শুনেছিলাম, এই কাউন্সিলসহ কৃষির অনেক ইনস্টিটিউট তাঁর হাতে গড়া। গল্প শুনতে শুনতে আমার মনে এমন একজন মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর সম্মান ও একটি বিমূর্ত অবয়ব তৈরি হলো। পাঁচ ফুট উচ্চতার, বাদামি রঙের কোট গায়ে, মুখে চুরুট বা পাইপ, এমন কাউকে কাউন্সিলের করিডোরে দেখলেই বুঝতে হবে তিনিই ড. কাজী বদরুদ্দোজা। রাশভারী ব্যক্তিত্ব। সদা কাজে মগ্ন থাকতেন। তাই তাঁর রুমে কেউ ঢুকতে হলে বার কয়েক দরজা হালকা ফাঁক করে ব্যস্ততা বুঝে ঢুকতে হতো। আমি তাঁর কক্ষটি দেখতাম। কক্ষের বাইরে একটি সাইনবোর্ড, যেখানে লেখা আছে ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজা, সায়েন্টিস্ট ইমিরেটাস, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।

প্রথম যোগাযোগ

সালটা ঠিক মনে নেই। হয়ত ১৯৮৮ হবে। একদিন আমাদের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. মতলুবুর রহমান স্যার আমাকে ফোন করে বললেন ড. বদরুদ্দোজা স্যারের সাথে দেখা করতে। আমি ছুটে গেলাম তাঁর রুমে। সেই প্রথম আমি তাঁকে সামনাসামনি দেখলাম। ঠিক যেমনটি কল্পনা করতাম তেমনই একজন ব্যক্তি। তাঁর সামনে দুজন বিদেশি ভদ্রলোক বসা। আমাকে দেখেই বদরুদ্দোজা স্যার জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই কি ফরিদ? আমি বললাম,

জ্বি স্যার, আমিই ফরিদ। তাঁর সামনে বসা দুজন বিদেশি ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, আমাদের দেশের বাঁশ সম্পর্কে তাঁরা জানতে চান। চেয়ারম্যান সাহেব তোমার কথা বললেন, তুমি নাকি ভালো তথ্য দিতে পারবে। বলো দেখি আমাদের কত জাতের ও কি পরিমাণ বাঁশ আছে, কোন জাতের কি ব্যবহার, প্রজনন পদ্ধতি, ইত্যাদি। আমি বললাম, স্যার ভালো হয় আমি একটি প্রেজেন্টেশন দিলে। উনি বললেন, এখানে নাকি অন্য কোথাও। বললাম ড. নওয়াজেশ আহমেদ স্লাইডের সাথে সাউন্ড সংযোগ করে বাঁশের ওপর একটি স্লাইড প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছেন বাঁশ বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য। সে প্রেজেন্টেশনটি শুনলে বাঁশ বিষয়ক সব তথ্য জানা যাবে। ড. নওয়াজেশ আহমেদ কাউন্সিলের একটি প্রকল্পের কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেন। ড. নওয়াজেশ আহমেদ বাঁশ বিষয়ক প্রযুক্তি হস্তান্তর মডিউল তৈরি করতে যাবতীয় তথ্যের জন্য আমার সাহায্য নিয়েছিলেন। তাই উনার এই প্রেজেন্টেশনে যা কিছু আছে তা আমি তা বিশদভাবে জানি। বলা বাহুল্য, তখন মাইক্রোসফট ছিল না। তাই পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনও ছিল না। আমরা তখন ফ্লপি ড্রাইভ দিয়ে ডস অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে খুব স্বল্প মেমোরির কম্পিউটার চালাতাম। ওয়ার্ড প্রসেসিং এর জন্য আমরা ভক্স রাইটার নামক একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করতাম। তবে কোথাও কোথাও ওয়ার্ড প্রসেসিং এর জন্য ওয়ার্ডস্টার ব্যবহার করা হতো। প্রেজেন্টেশন এর জন্য ছিল স্লাইড প্রজেক্টর। ক্যামেরায় ছবি তুলে স্লাইড এর জন্য ডেভেলপ করে প্লাস্টিক দিয়ে বাঁধাই করে স্লাইড প্রজেক্টর মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন তৈরি করা হতো।

দুইজন বিদেশি ও ড. বদরুদ্দোজা স্যারসহ আমি কাউন্সিলের এগ্রিকালচার ইনফরমেশন সেন্টারে সালাহউদ্দিন সরকার সাহেবের কাছে গেলাম। সালাহউদ্দিন সরকার সাহেবের সহায়তায় স্লাইড ও সাউন্ড সিস্টেম চালু করে বাঁশ প্রযুক্তির প্রেজেন্টেশনটি সেট করা হলো। তিনি প্রেজেন্টেশন সেট করে দিলেন। বাঁশ বিষয়ের প্রেজেন্টেশনটি ছিল বাংলায়। আমি প্রেজেন্টেশন চলার সাথে সাথে তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে বর্ণনা করছিলাম। তিনজনেই খুব পছন্দ করলেন প্রেজেন্টেশন। যে তথ্যের সন্ধানে তাঁরা এসেছিলেন তার সবটাই তাঁরা পেলেন। বদরুদ্দোজা স্যার আমাকে নিয়ে আবার উনার রুমে গেলেন। বললেন, তোমার প্রেজেন্টেশনটি খুব সুন্দর হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই বন গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এসেছো। তোমার বিষয়-জ্ঞান ও ইংরেজি

বলার দক্ষতাও বেশ ভালো। আমি স্যারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে আমার রুমে চলে গেলাম।

পরদিন স্যার আমাকে আবার ডাকলেন। আমাকে স্যার কিছু ড্রাফট করতে দিলেন, যা ছিল কৃষি গবেষণা ও কৃষির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংক্রান্ত। আমি খুব অল্প সময়ে কম্পিউটার কম্পোজ করা ড্রাফট স্যারকে দিলাম। উনি পড়লেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এত তাড়াতাড়ি কম্পিউটার কম্পোজ করে নিয়ে আসলে কেমন করে? আমি বললাম, স্যার কাউন্সিল আমাদের ফরেস্ট্রি ডিভিশনে একটি কম্পিউটার দিয়েছে যা আমি ব্যবহার করি। আমি নিজেই কম্পিউটার কম্পোজ করি। স্যার ড্রাফট দেখে খুশি হলেন। কোনো পরিবর্তন না করে সে ড্রাফট ফাইনাল বিবেচনা করে কোথায় যেন পাঠালেন। এরপর থেকে স্যার কোনো কিছু ড্রাফট করতে হলে আমাকে ডাকতেন। আমি উনার আস্থাভাজন হলাম এবং উনার লেখালেখির কাজে সহায়তা করতাম।

বাংলাদেশের উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্যের তালিকা প্রণয়ন

১৯৯৪-৯৫ সাল আমার কেটেছে বিলেতে। দেশে ফিরে স্যারের রুমে গিয়ে দেখি স্যার বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনের এজেন্ডা ২১ এর জীববৈচিত্র্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের করণীয় নিয়ে খুবই ব্যস্ত। স্যারের রুমে প্রতিদিন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আনাগোনা। এর মধ্যে ছিলেন বেসরকারি সংস্থা উবিনিগ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ফরহাদ মাজহার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর লুৎফুর রহমান, কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ড. গুল হোসেন ও ড. মো: আবদুর রাজ্জাক। আমাকেও ডাকা হলো আলোচনায়। আলোচনার মূল বিষয় ছিল কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি বা সিবিডি এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের জীববৈচিত্র্যের তালিকা তৈরি করা। স্যার প্রস্তাব করলেন, এ কাজটি জাতীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক প্রতিষ্ঠান জড়িত। তাই কাজটি করতে হলে মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা আবশ্যক। এ বিষয়ে কাজ করার জন্য একটি কমিটিও প্রয়োজন। কাজেই কৃষি মন্ত্রণালয়ে 'জীববৈচিত্র্য বিষয়ক একটি জাতীয় কমিটি' গঠনের প্রস্তাব পাঠাতে হবে। প্রস্তাব কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পাঠানো হলো। তখন কৃষি

মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন ড. শওকত আলী। তিনি ড. বদরুদ্দোজা স্যারকে খুব সম্মান করতেন এবং স্যারের ওপর আস্থা রাখতেন। প্রস্তাব পেয়েই কৃষি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে দিলেন যার নাম দেয়া হলো 'ন্যাশনাল কমিটি অন প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস (NCPGR)'। ড. বদরুদ্দোজা এ কমিটির কনভেনর এবং ড. গুল হোসেন সদস্য সচিব। কমিটি প্রথম যে কাজটি করলো তা হলো জীববৈচিত্র্য বিষয়ক একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন। এর অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতা দিয়েছিল 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস (IPGRI)'। সে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ কর্মশালা আয়োজনে সহায়তা করেছিলেন। তাঁদের একজনের নাম ছিল ড. ভগমল, অন্য জনের নাম আমার মনে নেই। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক প্রবন্ধ আহ্বান করা হলো। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে তাদের তাৎক্ষণিক সংগ্রহে থাকা জীববৈচিত্র্যের তথ্য কর্মশালায় উপস্থাপিত হলো। ড. ভগমল ও তাঁর সহেযোগী কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সিদ্ধান্ত হলো বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের যে তথ্য কর্মশালায় পাওয়া গেছে তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ তথ্য দেশের মোট জীববৈচিত্র্যের বিশাল ভান্ডারের একটি অংশমাত্র। তাই বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল বাংলাদেশে প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস সঠিকভাবে সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবহার এর জন্য একটি 'জাতীয় প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্স ইনস্টিটিউট' স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে। ন্যাশনাল কমিটি অন প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস এ বিষয়ে সরকারকে যাবতীয় সহায়তা প্রদান করবে। ড. বদরুদ্দোজা স্যার আমাকেই দায়িত্ব দিলেন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্যের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের জন্য। এছাড়া, কাউন্সিলের পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগের সহায়তায় 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস' স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প তৈরি করতে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি নার্সভুক্ত সকল ইনস্টিটিউটকে এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন, বন অধিদপ্তরের বোটানিক্যাল গার্ডেন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক তথ্য পাঠানোর অনুরোধ

জানালাম। সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক তথ্যের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হলো। কাজী স্যার বললেন, প্রতিটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম সঠিক আছে কী না, তা নিরীক্ষা করতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়ামের অধ্যাপক সালার খাঁন সাহেবের সহযোগিতা নিতে হবে। কাজী স্যার নিজেই সালার খাঁন স্যারের সাথে আলাপ করেন। অধ্যাপক সালার খাঁন স্যার উদ্ভিদের তালিকা দেখে সব বৈজ্ঞানিক নাম ঠিক করে দিলেন। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক চূড়ান্ত রিপোর্ট ২০০০ সালে আমি কাজী স্যারের হাতে দিয়েছিলাম।

ড. এম. নুরুল আলম ও আমার প্রণীত 'ন্যাশনাল প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট' স্থাপন বিষয়ক প্রকল্প প্রস্তাব ১৯৯৯ সালে কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। তখন পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি বিভাগের সদস্য ছিলেন ড. তওফিক এলাহি। তিনি এ প্রকল্পের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন। তবে সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের প্রস্তাব মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশন একটি নতুন ইনস্টিটিউটের পরিবর্তে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ও ইনস্টিটিউট চত্বরে 'প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্স সেন্টার' করার প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন দেয়। পরবর্তীতে সেভাবেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মমতাজ এ প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ও প্লান্ট ভ্যারাইটিজ প্রটেকশন এ্যাক্ট এর খসড়া প্রণয়ন

ড. বদরুদ্দোজা ছিলেন অনেক দূরদর্শী। ড. বদরুদ্দোজা যখন জীববৈচিত্র্য তথ্য ভাণ্ডার তৈরি ও দেশের জীববৈচিত্র্যের ওপর বাংলাদেশের অধিকার নিশ্চিতকরণে দ্রুত পদক্ষেপের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তখন সরকারের অন্যান্য সংস্থাসমূহ এ বিষয়ে কোন উদ্যোগই গ্রহণ করে নি। উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্য এর তালিকা তৈরির পাশাপাশি ড. বদরুদ্দোজা 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন' ও 'প্লান্ট ভ্যারাইটিজ প্রটেকশন এ্যাক্ট' এর খসড়া তৈরির কাজও শুরু করেছিলেন ১৯৯৮ সালে। এ কাজে বেসরকারি সংস্থা উবিনিগ এর

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফরহাদ মজহার ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুৎফর রহমান মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের সহযোগতিা করেছিলেন ড. গুল হোসেন, ড. এম, এ, রাজ্জাক ও আমি। ফরহাদ মজহার সাহেব ফিলিপাইন ও ভারতের ড্রাফট বায়োডাইভার্সিটি এ্যাক্ট এর খসড়া জোগাড় করে নিয়ে আসলেন। সে খসড়ার অনুকরণে ২০০০ সালে 'বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য আইন' ও 'প্ল্যান্ট ভ্যারাইটিজ প্রটেকশন আইন' এর খসড়া তৈরি করা হলো। ড. বদরুদ্দোজা স্যার খসড়া দুটি পড়ে আমাদের সবাইকে ডেকে এর কোন কোন স্থানে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে হবে তার নির্দেশনা দিলেন। খসড়া চূড়ান্ত করার পর ফরহাদ মাজহার সাহেব খুব সুন্দর করে প্রতিটি খসড়া আইনের ১০ কপি বাঁধাই করে নিয়ে এসে স্যারের হাতে তুলে দিলেন। স্যার এ দুটি খসড়া আইন এর কপি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করলেন।

খসড়া জীববৈচিত্র্য আইন নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করলে পরিবেশ অধিদপ্তর জানালো যে জীববৈচিত্র্য আইন করতে হলে এ কাজ করবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। কারণ ফোকাল মিনিস্ট্রি হলো পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং ফোকাল ইনস্টিটিউট হলো পরিবেশ অধিদপ্তর। এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে তৎকালীন কৃষি সচিব ড. শওকত আলী একটি মিটিং ডাকলেন। মিটিংয়ে ড. বদরুদ্দোজা স্যারকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। ড. বদরুদ্দোজা স্যার আমাকে নিয়ে মিটিংয়ে গেলেন। সে মিটিংয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ও আসলেন। তখন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন জনাব মারগুব মোর্শেদ। ড. শওকত আলী কাজী স্যারকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আপত্তির বিষয়টি জানালেন এবং বললেন যেহেতু পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ফোকাল মিনিস্ট্রি তাই আপনার উপস্থিতিতে আমি আপনাদের প্রণীত জীববৈচিত্র্য আইনের খসড়া পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব সাহেবের কাছে হস্তান্তর করে দিতে চাই।বদরুদ্দোজা স্যার বললেন দেশের প্রয়োজনে আমরা এ আইনের খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি। কাজেই এতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক আইনের খসড়া তৈরির উদ্যোগটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনেক আগেই নেয়া উচিত ছিল। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। দেরি করলে আমাদের অনেক উদ্ভিদের মালিকানা অন্য দেশ তাদের

নামে রেজিস্ট্রি করে নেবে। তাই এ আইনটি অতিদ্রুত চূড়ান্ত করে সংসদে নিয়ে যাওয়া সমীচীন। পরিবেশ সচিব ড. বদরুদ্দোজা স্যারকে ধন্যবাদ দিয়ে আইন দুটি চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি বা সিবিডি'তে স্বাক্ষর করলেও দেশের জীববৈচিত্র্য আইন প্রণয়নে ড. বদরুদ্দোজা অতি দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এতেই বোঝা যায় উনি কত দূরদর্শী ছিলেন।

কৃষির স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়ন

সঠিক তারিখ আমার মনে নেই। নব্বই এর দশকের মাঝামাঝি হবে। বিশ্বব্যাংক কৃষি সেক্টরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। তবে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নের পূর্বশর্ত ছিল কৃষি সেক্টরের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান থাকতে হবে। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান তৈরির জন্য বিশ্বব্যাংক কনসালট্যান্ট হিসেবে ড. ফসিহ উদ্দিন মাহতাব ও ড. ইউসুফ জাই সাহেবকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। উনারা দুজনেই কাউন্সিলেই বসতেন এবং কাউন্সিলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে খসড়া স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়ন করলেন। তাঁরা যখন চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করে বিশ্বব্যাংকে জমা দিলেন, বিশ্বব্যাংকের কাছে এ রিপোর্ট অসম্পূর্ণ মনে হলো। তখন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন ড. জহুরুল করিম। বিশ্বব্যাংকের একজন প্রতিনিধি ও ড. জহুরুল করিম ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট এর রুমে এসে বদরুদ্দোজা স্যারকে ব্যাপারটি খুলে বললেন এবং স্যারকে অনুরোধ করলেন কৃষির খসড়া স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটি স্যারকে তৈরি করে দেয়ার জন্যে। স্যার কাজটি করতে সম্মত হলেন দুটি শর্তে। প্রথমত: কাজটি করতে স্যারকে কাউন্সিলের পাঁচজন কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক এর জন্য দিতে হবে এবং দ্বিতীয়ত এ পাঁচজন কর্মকর্তাকে তাঁদের কাজের একটি সম্মানী দিতে হবে। তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন তিনি নিজে কোনো সম্মানী নিবেন না। ড. জেড করিম জানালেন স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অনুমোদনের পর কাউন্সিল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান অনুসারে প্রথম পাঁচ বছরের অর্থায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট একটি প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেবে। প্রকল্প প্রস্তাবে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়নের জন্য সম্মানী রাখার প্রস্তাব করা হবে। যদি বিশ্বব্যাংক অনুমোদন দেয়, তবেই এই সম্মানী দেয়া যাবে। বদরুদ্দোজা স্যার এমন দীর্ঘ জটিল প্রক্রিয়ায় রাজি হলেন

না। ড. জেড করিম জানালেন, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়নের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমান অবস্থায় একমাত্র মন্ত্রণালয় যদি এ কাজটি করার জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ দেয় তবেই সম্মানী দেয়া সম্ভব হবে। এ জটিল পরিস্থিতিতে কৃষি সচিব ড. শওকত আলী ড. বদরুদ্দোজা স্যারকে চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুরোধ করলেন স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটি তাঁকে করে দিতে হবে এবং তিনি প্রস্তাব মোতাবেক পাঁচজন কর্মকর্তার সম্মানির ব্যবস্থা করবেন। যে পাঁচজন কর্মকর্তা ড. বদরুদ্দোজা চাইলেন তাঁরা হলেন ড. ইন্দ্রজিৎ রায়, ড. গুল হোসেন, ড. জাহাঙ্গীর আলম, ড. নুরুল আলম এবং আমি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ। কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান সে মোতাবেক পাঁচজন কর্মকর্তাকে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়নের জন্য সার্বক্ষণিক কাজী বদরুদ্দোজা স্যারের অধীনে কাজ করার জন্য চিঠি ইস্যু করে দিলেন। কাজী স্যার প্রথমে একটি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের কাঠামো তৈরি করে দিলেন। কি কি তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, কে কি লিখবেন তার নির্দেশনা দিলেন। বিএআরসি এর লাইব্রেরি-বিল্ডিং এর চার তলায় আমাদের জন্য একটি রুম বরাদ্দ দিলেন। সাথে চা নাস্তার ব্যবস্থাও করলেন। একজন অফিস সহায়ক দিলেন কম্পিউটার কম্পোজ করতে এবং একজন পিয়নকে দিলেন আমাদের জন্য চা নাস্তা তৈরি করে দিতে। স্যার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তদারকি করতেন। স্যার এর একটি টাইপ রাইটার ছিল। স্যার রাতে বসে তাঁর কথাগুলো টাইপ করে নিয়ে আসতেন। ড. বদরুদ্দোজা স্যারকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে উনি খুব অস্থির প্রকৃতির মানুষ। একটা কাজ হাতে নিলে যাঁরা এর সঙ্গে জড়িত তাঁদের দিন রাতের যে কোন সময়ে ফোন দিয়ে কতদূর হলো, কেন দেরি হচ্ছে, নানা বিষয়ে তদারকি করতেন। তিনি রাত জেগে জেগে বাসায় এসি চালিয়ে কাজ করতেন। একবার তাঁর খুব ঠান্ডা লেগে গেলো। কিন্তু তাঁর কাছে শরীরের চাইতে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্যারের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তবুও বুকে ঠান্ডা আর জ্বর নিয়ে অফিসে চলে আসলেন। অফিস রুমে বসে কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। ড. জেড করিম তাঁর রুম থেকে দৌড়ে আসলেন। কাউন্সিলের ডাক্তার সাহেবও আসলেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক স্যারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সবাই ব্যর্থ হলেন। তখন আমাদের চেয়ারম্যান ড. জেড করিম আমাকে বললেন, তোমার কথা স্যার শুনবেন। তুমি একটু চেষ্টা করো। আমি সফল

হলাম। কাজী স্যারকে বললাম, জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউটে আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছেন। আমি আপনাকে তাঁর কাছেই নিয়ে যাবো। আপনার ব্লাড টেস্ট করেই আমরা চলে আসবো। অনেক কষ্টে স্যারকে রাজি করানো গেল। হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। আমার বাসা হাসপাতালের পাশেই। স্যারের ব্লাড টেস্ট করে দেখা গেল স্যার এর হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। আমার বন্ধু ডা. আফতাব বললেন উনাকে কিছুতেই বাসায় নেয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে স্যারকে হাসপাতালে ভর্তি করালাম। প্রায় এক সপ্তাহ স্যার হাসপাতালে ছিলেন। আমরা সবাই স্যারকে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দিয়েছিলাম। কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী নিজে এসে স্যারকে দেখে গেলেন। এরমধ্যে স্যারের মেয়ে ডাক্তার তাসনিম আসলেন আমেরিকা থেকে। স্যার হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় যাওয়ার পর তাসনিম স্যারকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য আমেরিকা যান। কিন্তু কাজ পাগল স্যারকে বেশিদিন রাখতে পারেন নি। স্যারের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের কাজ শেষ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান শেষ করলেন। বিশ্বব্যাংক এ প্ল্যান অনুমোদন করলো। কাউন্সিল পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্প তৈরি করলো। আমরা পাঁচ জন ভালো অঙ্কের সম্মানী পেলাম। স্যার কিছুতেই কোনো সম্মানী গ্রহণ করলেন না। দেশের প্রয়োজনে কৃষির উন্নয়নে তাঁর পক্ষে যা কিছু সম্ভব তা তিনি করে যাবেন, এই ছিল তাঁর ব্রত। তাঁকে সরকার যখন ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট এর পদ দিয়ে সম্মানিত করলেন সরকার তাঁকে একটি মাসিক ভাতা ও বাড়ি ভাড়া দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বললেন, আমি নিজের বাড়িতে থাকি এবং সরকারের কাছ থেকে কোন ধরনের টাকা নেয়া মানেই হলো টাকার বিনিময়ে কাজ করা। আমি তা চাই না। তিনি ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট হিসেবে শুধু সরকারের বরাদ্দ দেয়া গাড়ি বাসা থেকে অফিস ও অফিস থেকে বাসায় আসা যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতেন। অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। নিজের বাড়িটা ছিল ডুপ্লেক্স হলেও দুই তলা মিলিয়ে সর্বমোট ১০০০ বর্গফুট। দেশী ফল পছন্দ করতেন। এভোক্যাডো ফল এর প্রতি ভীষণ দুর্বল ছিলেন। কৃষি গবেষণার আট জাতের এভোক্যাডোর পারফরমেন্স সম্পর্কে প্রতিনিয়ত তথ্য নিতেন। পরবর্তীতে বারি মালটা-১ নিয়ে উনার আগ্রহের সীমা ছিল না।

দূরদর্শী কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী ও ব্যবস্থাপক

ড. বদরুদ্দোজা আন্তর্জাতিক মানের কৃষিবিজ্ঞানী ছিলেন। তবে আমি মনে করি, তাঁর বড় পরিচয় হলো তিনি একজন দূরদর্শী কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী ও গবেষণা পদ্ধতি ব্যবস্থাপক। তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এসে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কৃষির সমৃদ্ধি ও ক্ষুধা নিবারণে কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে কৃষি বিষয়ক সকল গবেষণা ইনস্টিটিউটের এপেক্স বডি হিসেবে দাঁড় করিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন ইনস্টিটিউট তৈরির উদ্যোগ নেন এবং এসব ইনস্টিটিউটের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েন। তিনি যাঁর মধ্যে যোগ্যতা দেখতেন তাঁকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ পাঠিয়েছেন। ইউএসএইড ও বিশ্বব্যাংক তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন বিধায় টাকার জন্য তাঁকে কোন চিন্তা করতে হয়নি। দৃঢ়চিত্তের এ মানুষটিকে কেউ দেখেছেন পজিটিভ দৃষ্টিতে, আবার তাঁর দৃষ্টিতে যিনি উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি তিনি হয়ত স্যারকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু তাঁর কোনো ব্যক্তি স্বার্থ ছিল না। হয়ত উনার মূল্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন করা যায় কিন্তু অন্য কোনোভাবে তাঁকে দেখলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। আজ বাংলাদেশে কৃষির সাফল্যের পেছনে ড. বদরুদ্দোজা এর অবদান সকলেই স্বীকার করেন। আমার মতে তাঁকে যতটা বিজ্ঞানী হিসেবে দেখা উচিত তার চাইতে উনার বড় অবদান কিন্তু রিসার্চ সিস্টেম ম্যানেজমেন্টে। উনি একা ভালো কাজ করার চাইতে সবাইকে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাই আমার দৃষ্টিতে উনি একজন সফল কৃষি আর্কিটেক্ট। সফল পরিকল্পনাকারী ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী। আমার দৃষ্টিতে তিনি বাংলাদেশের কৃষিপিতা।

দূরদর্শী কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী ও ব্যবস্থাপক

ড. বদরুদ্দোজা আন্তর্জাতিক মানের কৃষিবিজ্ঞানী ছিলেন। তবে আমি মনে করি, তাঁর বড় পরিচয় হলো তিনি একজন দূরদর্শী কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী ও গবেষণা পদ্ধতি ব্যবস্থাপক। তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এসে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কৃষির সমৃদ্ধি ও ক্ষুধা নিবারণে কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে কৃষি বিষয়ক সকল গবেষণা ইনস্টিটিউটের এপেক্স বডি হিসেবে দাঁড় করিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন ইনস্টিটিউট তৈরির উদ্যোগ নেন এবং এসব ইনস্টিটিউটের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েন। তিনি যাঁর মধ্যে যোগ্যতা দেখতেন তাঁকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ পাঠিয়েছেন। ইউএসএইড ও বিশ্বব্যাংক তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন বিধায় টাকার জন্য তাঁকে কোন চিন্তা করতে হয়নি। দৃঢ়চিত্তের এ মানুষটিকে কেউ দেখেছেন পজিটিভ দৃষ্টিতে, আবার তাঁর দৃষ্টিতে যিনি উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি তিনি হয়ত স্যারকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু তাঁর কোনো ব্যক্তি স্বার্থ ছিল না। হয়ত উনার মূল্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন করা যায় কিন্তু অন্য কোনোভাবে তাঁকে দেখলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। আজ বাংলাদেশে কৃষির সাফল্যের পেছনে ড. বদরুদ্দোজা এর অবদান সকলেই স্বীকার করেন। আমার মতে তাঁকে যতটা বিজ্ঞানী হিসেবে দেখা উচিত তার চাইতে উনার বড় অবদান কিন্তু রিসার্চ সিস্টেম ম্যানেজমেন্টে। উনি একা ভালো কাজ করার চাইতে সবাইকে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই আমার দৃষ্টিতে উনি একজন সফল কৃষি আর্কিটেক্ট। সফল পরিকল্পনাকারী ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী। আমার দৃষ্টিতে তিনি বাংলাদেশের কৃষিপিতা।

স্বপ্নদ্রষ্টার অবসর থাকেনা

অবসরের পর ভিয়েতনাম থেকে কনসালট্যান্ট হিসেবে চাকুরি করে দেশে ফিরে এলে আবার দেশের কাজে লেগে গেলেন। তাঁর নেতৃত্বে ৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে একটি বেসরকারি নীতিনির্ধারণী ইনস্টিটিউট তৈরি হলো, যার নাম হলো 'বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার'। প্রবীণ বিজ্ঞ কৃষিবিদ ও কৃষিবিজ্ঞানীদের নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান। আহ্বান জানালেন উদ্যোগী কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষিবিদ যারা সদ্য অবসর নিয়েছেন বা অবসরের দ্বারপ্রান্তে। টাকার বিনিময়ে কাজ নয়, বরং টাকা দিয়ে কাজ করার মতো আগ্রহীদের উনি আহ্বান জানালেন একাডেমির ফেলো হতে। ফেলোগণের টাকায় শুরু হলো একাডেমি। একাডেমির সব ফেলোগণ অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান। নিজ নিজ বিষয়ে দক্ষ। তাঁদের সংগঠিত করে কৃষির বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে পরামর্শ দেয়া এবং সরকারের নীতি নির্ধারণীতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এ একাডেমির সৃষ্টি। তিনি আমৃত্যু এ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট

হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুর দুই দিন আগেও সাধারণ সম্পাদককে জিজ্ঞেস করেছিলেন পরবর্তী মিটিং কবে। তিনি চেয়ার করবেন বলে জানিয়েছেন। এমন কাজ পাগল ছিলেন এ মানুষটি। বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার এর কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ মানুষ স্যারকে সব সময় সব বিষয়ে নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করতেন। তাঁরা সব সময়েই পরিবারের সদস্যের মতোই স্যারের পাশে থাকতেন। তাঁদের কারণে স্যারের একাকীত্ব ঘুচে গিয়েছিল। সব সময় এসে গল্প করতেন, স্যারের পছন্দের খাবার তৈরি করে নিয়ে আসতেন। স্যারও তাঁদের পরিবারের সাথে মিশে যেতেন।

সুপারিশ করার ভালো-মন্দ দিক

স্যার সব সময় মানুষকে সাহায্য করতে ভালোবাসতেন। কেউ চাকুরির জন্য সুপারিশ করতে আসলে তিনি ঠিকই সুপারিশ করতেন। অনেকেই স্যারের সুপারিশের কারণে উপকৃত হয়েছেন। এ সরলতা এবং যোগ্যতা বিচার না করে সবাইকে সাহায্য করার চেষ্টা অনেক সময় হয়ত অন্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একবার আমি স্যারের বাসায় বসা। এমন সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর ভিসি মহোদয় স্যারের সাথে দেখা করতে আসলেন। বিভিন্ন গল্পের পর স্যার ভিসি সাহেবকে বললেন, আগামীকাল তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদের ইন্টারভিউ। স্যার একজন ক্যান্ডিডেটকে লেকচারের পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করলেন। ওই ক্যান্ডিডেট আমার ছাত্র। আমি তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলাম। যে ছাত্রের জন্য স্যার সুপারিশ করলেন, সে আমার ছাত্র। আমি সেই ছাত্রকে খুব ভালো করে জানি। ক্লাসে তার চাইতে অনেক মেধাবী ছাত্র ছিল। মাস্টার্স পরীক্ষায় তার স্থান ছিল অনেক নিচে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারীকে বঞ্চিত করে পঞ্চম স্থান অধিকারীকে প্রভাষক পদে নিয়োগ দিলে সুবিচার হবে না। স্যার যখন ভিসি মহোদয়কে ওই ছাত্রের জন্য সুপারিশ করলেন, আমি দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলাম। বললাম, স্যার আপনি অত্যন্ত সরল মনের মানুষ ও ভীষণ সম্মানিত একজন মানুষ। আপনার অনুরোধ ভিসি সাহেবের কাছে আদেশের মতোই। আর আপনার এই অনুরোধে একজন অযোগ্য ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেলে যোগ্য ছাত্রটি বঞ্চিত হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় একটি বোঝা ৪০ বছর টানবে। ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভিসি সাহেবের সামনে আমার এমন অযাচিত

উপদেশ স্যার সহ্য করতে পারেন নি। উনি আমার ওপর ভীষণ রেগে গেলেন। অনেকটা রাগে কাঁপতে শুরু করলেন। বলতে গেলে আমাকে বাসা থেকে বের করে দিলেন। আমি নীরবে চলে আসলাম। ড. বদরুদ্দোজা স্যার প্রতিদিন ভোর ৬-৭ টায় আমাকে ফোন করেন। উনি ফোন না করলে আমি নিজেই ফোন করে স্যারের খবর নিতাম। আমাদের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মতো। পরদিন ভোর পাঁচটায় আমার ফোন বেজে উঠলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি ভয়ে ভয়ে ফোন ধরে যেই বলতে যাবো স্যার আপনি কি আমার কথায় খুব কষ্ট পেয়ে সারা রাত ঘুমান নি, তার আগেই বলে বসলেন আমি গতকাল সারা রাত ঘুমাই নি। ভেবে দেখলাম, তুমি ঠিকই বলেছো। আমি একটু পর ভিসি সাহেবকে ফোন করে বলবো তোমরা যোগ্য প্রার্থীকেই নিয়োগ দিও। তিনি ঠিকই বলেছেন। ভিসি সাহেবও আমাকে ফোন করে ধন্যবাদ জানালেন তাঁকে উদ্ধার করার জন্য। সত্যি বলতে কি, স্যারের ব্যক্তিত্ব এত বিশাল ছিল যে, তাঁর অনুরোধ অধনস্তদের কাছে আদেশ হয়ে যেতো। স্যারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এমন অনেকে চাকুরি পেয়েছেন যেখানে তাদের চাইতে যোগ্য লোক বঞ্চিত হয়েছেন। তাই আমি মনে করি বড় মাপের মানুষের খুব সরল হওয়া এবং সকলের অনুরোধ রক্ষা করার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া ভালো। স্যার যেমন উদার ছিলেন, তেমনি ছিলেন অভিমানীও। অনেক সময় ছোট খাট বিষয়ে স্যারকে অভিমান করতে দেখেছি। স্যারের কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে স্যার খুব অভিমান করতেন। কিছুদিন ফোন করতেন না। কিন্তু এ অভিমান সাময়িক। বাসায় গিয়ে হাজির হলে আবার সব ঠিক হয়ে যেতো।

একসাথে বিদেশ ভ্রমণ

একবার আমি অফিসের একটি প্রোগ্রামে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি যাবো। স্যারকে বললাম আমি সিডনি যাচ্ছি। স্যারের বড় ছেলে মর্তূজা কাজী লেমন সেখানেই থাকে। আমি জানতে চেয়েছিলাম স্যার তাঁর জন্য কিছু দিবেন কি না। স্যার বললেন কবে যাবে। আমি বললাম একমাস পর। স্যার বললেন, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। যেই বলা সেই কাজ। স্যার আর আমি এক সাথে অস্ট্রেলিয়া গেলাম। আমি স্যারের বড় ছেলে লেমনের বাসায় দুই রাত থেকে পরে অফিসের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। স্যার যেখানেই যান, সেখানে বাংলাদেশি কৃষিবিদদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। স্যারকে সবাই খুব সম্মান করেন। আমি মাত্র পাঁচ দিন ছিলাম। কিন্তু স্যার একমাস পর দেশে ফিরলেন।

ড. বদরুদ্দোজা স্যারের বিদায়

স্যারের যে কোন শারীরিক সমস্যা হলে তাঁর পরিষেবক আশীষ আমাকে ফোনে জানায়। স্যার আমাকে সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন। স্যারও আমাকে জানাতেন। ২০২৩ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে আশীষ আমাকে ফোনে জানালো স্যারের কাশিটা দিন দিন বাড়ছে, কমছে না। স্যার কেমন যেন দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন, খেতে পারছেন না। স্যারের মেয়ে ডা. তাসনিম ও ছেলে ডা. সনি আমার কাছেই স্যারের শারীরিক অবস্থা জানতে চাইতেন। স্যার খুব বেশি কথা বলতে পারতেন না। আমি বেলা ১২ টায় স্যারের বাসায় গিয়ে পৌঁছালাম। স্যারের অবস্থা আমার কাছে ভালো মনে হলো না। আমি সাথে সাথে মাসুম ভাইকে ফোন দিলাম। মাসুম ভাই হলেন সুপ্রিম সিড কোম্পানির চেয়ারম্যান। মাসুম ভাই স্যারের খুব কাছের মানুষ। স্যারের যে কোনো প্রয়োজনে তাঁকেই আমরা সবাই ফোন করি। স্যারও তাঁকে ফোন করেন। মাসুম ভাই বললেন, উনি গতকাল রাতে স্যারকে দেখে এসেছেন। স্যারকে হাসপাতালে চেক আপ করার জন্য নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্যার রাজি হন নি। আমি বললাম, মাসুম ভাই - একটু আসবেন? আমি স্যারের বাসায় আছি। মাসুম ভাই চলে আসলেন। আমরা দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম স্যারকে নেবুলাইজ করাবো। মাসুম ভাই ক্রিসেন্ট হাসপাতালের একজন নার্স ডেকে আনলেন। তাঁকে দিয়ে নেবুলাইজ করানো হলো। মনে হলো স্যার একটু ভালো বোধ করছেন। আমরা স্যারের মেয়ে ডা. তাসনিমকে জানলাম। তাসনিম স্যারকে ভিডিওতে দেখে বললেন সন্ধ্যায় আবার নেবুলাইজ করাতে। যথারীতি আমরা সন্ধ্যায় আবার নেবুলাইজ করালাম। কিন্তু অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হলো না। মাসুম ভাই বললেন, এভাবে হবে না। স্যারকে আর বাসায় রাখা যাবে না। চলুন আমরা স্যারকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। টেস্ট করার পর যদি ডাক্তার বলেন উনার নিউমোনিয়া বা ঠান্ডা লেগেছে, তাহলে আমরা স্যারকে বাসায় নিয়ে আসবো। স্যারকে আমরা দু'জনে মিলে হাসপাতালে যেতে রাজি করালাম। বাংলাদেশের সব হাসপাতালে তখন ডেঙ্গুরোগী। কোন ভালো হাসপাতালে সিট নেই। মাসুম ভাই বললেন, স্যারকে শীপ ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে নিয়ে যাবো। শীপ ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালটি জাপান বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে। ওখানে আমার পরিচিত একজন আছেন। তিনি যেভাবেই হউক স্যারের নাম শুনলেই স্যারকে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেবেন।

মাসুম ভাইয়ের গাড়িতে করে আমরা স্যারকে নিয়ে চলে গেলাম শীপ ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে। হাসপাতালটি ঢাকা আশুলিয়া রোডের মাঝামাঝি। উত্তরা থেকে যাতায়াতের রাস্তা ভালো নয়। রাস্তার উন্নয়নের কাজ চলছিল। শিপ হাসপাতালে পৌঁছে মাসুম ভাই হামিদ সাহেবকে কল দিলেন। হামিদ সাহেব কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে অবসর নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পে কাজ করছেন। বদরুদ্দোজা স্যার হামিদ সাহেবকে খুব পছন্দ করেন। হামিদ সাহেবও স্যারের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। প্রায়ই স্যারের বাসায় গিয়ে স্যারের খোঁজ খবর নেন। মাসুম ভাই ফোন করে জানালেন আমরা স্যারকে শীপ ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। এ হাসপাতালে হামিদ সাহেবেরও একজন পরিচিত ব্যক্তি আছেন। উনিও তাঁকে বলে দিলেন। আমরা স্যারকে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেলাম। ইমারজেন্সি ডাক্তার প্রাথমিক পরীক্ষার পর বললেন উনার সিভিয়ার নিউমোনিয়া হয়েছে। উনাকে ভর্তি করা ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। আমরা স্যারের মেয়ে ও ছেলের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদেরকে ইমারজেন্সি ডাক্তারের সাথে কথা বলিয়ে দিলাম। স্যারের ছেলে মেয়ে দুজনেই সিদ্ধান্ত দিলেন হাসপাতালে ভর্তি করাতে। হাসপাতালের ডাক্তারের পরামর্শ ছিল আইসিইউতে ভর্তির জন্য। আমরা বললাম রোগীর বিশেষ কিছু চাহিদা আছে যা তাঁর পরিষেবক আশীষ খেয়াল রাখতে পারে। আইসিইউতে আশীষকে নিশ্চয় থাকতে দেবেন না। আমরা তাই তাঁকে কেবিনেই দিতে অনুরোধ করলাম। আমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে স্যারকে কেবিনেই দেয়া হল। আমরা রাতে স্যারকে ভর্তি করিয়ে বাসায় ফিরে গেলাম।

পরদিন সকাল ১০টায় স্যারকে হাসপাতালে দেখতে গেলাম স্যারকে। দেখলাম স্যারের অবস্থা আরও খারাপ। ডাক্তারের পরামর্শে আমরা স্যারকে আইসিইউতে স্থানান্তর করালাম। আমরা শীপ ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালের ডাক্তারের সাথে স্যারের মেয়ে ডাক্তার তাসনিমের কথা বলিয়ে দিলাম। ডা: তাসনিম শীপ ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালের ডাক্তারের সাথে কথা বলে বুঝলেন তার বাবার সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে না। আমাদের পরামর্শ দিলেন স্যারকে অন্য কোনো হাসপাতালে নিয়ে যেতে। আমরা স্যারকে শিফট করে ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। মাত্র পাঁচ দিন সে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে স্যার চির বিদায় নিলেন। অবশ্য স্যারের দুই ডাক্তার ছেলে মেয়ে

আমেরিকা থেকে এসে স্যারের শেষ মুহূর্তে দেখাশোনা করেছেন।

মৃত্যুর দু-দিন আগে স্যার আনারসের জুস খেতে চেয়েছিলেন। আমি একটি আনারস কিনে সেই আনারসের জুস খাইয়েছিলাম। আমি প্রতিদিন ফেসবুকে স্যারের স্বাস্থ্যের আপডেট দিতাম যাতে সবাই জানতে পারেন স্যার হাসপাতালে। মন্ত্রী, সচিব ও স্যারের প্রিয় ব্যক্তিরা স্যারকে দেখে যেতে পারেন। একজন প্রতিমন্ত্রী, কৃষি সচিব ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান স্যারকে দেখতে এসেছিলেন। স্যারের মৃত্যুর পর অনেক টিভি চ্যানেল এসেছিল ইন্টারভিউ নিতে। মনে হলো জীবিত ড. বদরুদ্দোজা এর চাইতে মৃত ড. বদরুদ্দোজা অনেক বেশি সম্মান পেয়েছেন। স্যারকে গোসল দিয়ে জানাজা পড়ে বিদায় জানালাম ৩০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে রাতে উত্তরা থেকে আর পরদিন সকালে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে দ্বিতীয় জানাজা হয়ে চলে গেলেন গোবিন্দগঞ্জ। স্যারের ইচ্ছানুসারে শায়িত হলেন বাবা মায়ের পাশে। আমরা হারালাম বাংলাদেশের কৃষিপিতাকে।

স্যার রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী রাজিয়া কাজী যাঁর বয়স তখন ৯৪ বছর, এক ডাক্তার ছেলে ও এক ডাক্তার মেয়ে। বড় ছেলে ড. মর্তুজা কাজী লেমন দুরারোগ্য ব্রেস্ট ক্যান্সারে অস্ট্রেলিয়ায় মারা যান স্যারের মৃত্যুর প্রায় ১০-১২ বছর আগে। মৃত্যুকালে স্যারের দুই ছেলে মেয়ে পাশেই ছিলেন। সাথে ছিলেন দুই ছেলে মেয়ের সন্তান - ছেলে সনি এর মেয়ে নাদিয়া এবং মেয়ে তাসনিম এর এক কন্যা আয়েশা। বড় ছেলে লেমন এর স্ত্রী অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিলেন স্যারের মৃত্যুর দু'দিন পর। এছাড়াও স্যার রেখে গেছেন তাঁর শত-সহস্র গুণগ্রাহী, যাঁরা ছিলেন স্যারের পরিবারের সদস্যের মতোই অতি আপনজন।

স্যারের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতে সম্মানিত স্থান দান করেন।

লেখক : সাবেক সদস্য পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
সাবেক নির্বাহী পরিচালক, আরণ্যক ফাউন্ডেশন

The Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)

Records its deep appreciation of the contribution to international agricultural research provided over several years by the distinguished Bangladeshi scientist and research leader

Dr. Kazi M. Badruddoza

Honors

His Role and achievements as the architect of the agricultural research system in Bangladesh,

His outstanding success in harnessing agricultural research for development nationally, regionally, and internationally,

and

His inspiring leadership as Chairman, Bangladesh Agricultural Research Council; Member, CGIAR Task Force on Strengthening National Agricultural Research; and Founding Member, International Service for National Agricultural Research (ISNAR).

His CGIAR colleagues extend their personal felicitations, good wishes, and abiding respect to Dr. Badruddoza for his service in the cause of international development.

August 16, 1999

THE WORLD BANK
WASHINGTON, D.C.